মহানগরীর নারী

'Love-inadequacy is essentially a disorder of modern civilization, a payment demanded of us by our culture.'

Kenneth Walker.

মহানগরীর নারী

বাসুদেব মাইতি

প্রকাশ করেছেন :
সুকান্তকুমার হালদার,
নর-নারী পাবলিশিং কনসার্ন
২৬।১, শশীভূষণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ছাপিয়েছেন :
শ্রীহরিপদ পাত্র,
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২০, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
অরুণ দাস

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২
দাম : আড়াই টাকা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীতুলসীপ্রসাদ সেনশর্মা
শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীনন্দকুমার রায়
শ্রীনকুলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

ঃ মেদিনীপুর কলেজে
আমার সতীর্থ-বন্ধুদের
হাতে দিলাম ঃ

লেখকের অন্য গ্রন্থ—

স্বয়ংবর (২য় সং)

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য

কংসাবতীর চর (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশকের নিবেদন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে মানব-জীবনে সুরু হয়েছে একটা সামগ্রিক পট-পরিবর্তন। এই পট-পরিবর্তনে সব চাইতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে নগর-জীবনের প্রগতিশীল নর-নারীর প্রেমে এবং দাম্পত্য জীবনে। মহানগরীর হাল-ফ্যাসানী তরুণ-তরুণীর প্রেম আর দাম্পত্য যে কতো জটিল আর ঠুন্‌কো—তা বাসুদেববাবু তাঁর গল্পগুলিতে অতি নিপুণ চিত্রকরের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ক'রে একটি সংকলন-গ্রন্থ আমরা সহৃদয় পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। তাঁরা যদি সহৃদয়তার সংগে পুস্তকের মূল তত্ত্বটি গ্রহণ করেন, তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। নিবেদন ইতি—

২৫শে বৈশাখ ঃ ১৩৬২

প্রগতির পদক্ষেপ

সহরটা যেন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর জেগে-ওঠা ফসিল। নির্জীব। নিশ্চল।

নূতন-পুরাতন, ভগ্ন-অভগ্ন, উঁচু-নীচু, বিচ্ছিন্ন-অবিচ্ছিন্ন বাড়ীগুলি যেন সেই ফসিল কঙ্কাল—নির্জীব নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার অপেক্ষায়।

কিন্তু অকস্মাৎ যেন লক্ষ বছর পরে সে-পথের প্রাণ পেল, সে-ফসিল জেগে উঠল, সে-কঙ্কাল কথা কইল।

সেদিন সারা সহরে ভীষণ চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সহরের মানুষদের গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটা স্পন্দন দেখা দিল,—মরুখাতে প্রবাহিত জীবনে বহিঃ-সমুদ্রের বান ডেকে উঠল।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়ঃ নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটকে নাগরিক অভিনন্দন-জ্ঞাপন। কিন্তু এই মফঃস্বল সহরের জীবনে এটা অশ্রুতপূর্ব, অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিকও।

প্রথমে অভিনন্দন জানাল সরকারী কর্মচারীরা। তারপর পুলিশ-ক্লাব। তারপর বার-ক্লাব। তারপর দেখাদেখি একে-একে সহরের ছোট বড় প্রায় সব ক্লাব। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিনন্দন জানাতে তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। শুধু উঠে পড়ে লেগে গেল না, তারা যেন অচিন্ত্যনীয় অপূর্ব এমন একটা কিছু হাতে পেয়েছে যে-জন্য ক্ষেপে উঠল।

বুড়োদের সান্ধ্যরক-মজলিশে, যুবকদের রাস্তার মোড়ে-মোড়ে চায়ের আড্ডায় আর মেয়েদের অন্দর-মহলে তাদের মহড়ায় এইটাই হয়ে উঠল

মুখরোচক টপিক—রসাল আলোচ্যবিষয়, কাজেই কোনো ক্লাবের আওতায় পড়ে না এমন বিশিষ্ট নাগরিকরা এ-ব্যাপারে হয়ে উঠল চঞ্চল। তারা সভা করে ঠিক করল ম্যাজিষ্ট্রেটকে তারা নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবে এবং সেটা হবে গ্র্যাণ্ড স্কেলে। তাই তারা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলের কাছ থেকে তুলল চাঁদা—দু'চার আনা থেকে দু'দশ টাকা। তারপর কয়েকজন আহ্বায়ক সেজে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাল। ছাপিয়ে তা হ্যাণ্ডবিলের মতো বিলি করল।

আর আজকে সেই সম্বর্ধনার দিন সমাগত।

কাজেই ভোর-না-হতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং কর্তাব্যক্তিরা তরুণদের নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস-হলকে সুসজ্জিত করার জন্য হৈ-চৈ ফেলাল।

যথাসময়ে হলটি হয়ে উঠল লোকে-লোকারণ্য—যেন রথযাত্রার মেলা। যত লোকের বসবার স্থান তার চেয়ে বেশী লোক বসল, যতো লোকের দাঁড়াবার স্থান তার চেয়ে বেশী লোক ঠাসাঠাসি দাঁড়াল, দরজা জানলায় যতো লোকের দাঁড়াবার যায়গা তার চেয়ে অনেক বেশী লোক গাদাগাদি হল। তাছাড়া বাইরে বহুলোক দাঁড়িয়ে রইল। গোটা সহরটা যেন ভেঙ্গে পড়েছে। জনসমাবেশের এ-অবস্থা এ-হলে ইতিপূর্বের কোনো অনুষ্ঠানে ঘটেনি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে যথাসময়ে অনুষ্ঠান-সূচি সুরু হল: উদ্বোধনী-সঙ্গীত, কয়েকটি আধুনিক গান, কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকের সম্বর্ধনা বক্তৃতা। শেষে সভাপতি দিলেন এক উদ্দীপনী ভাষণ—ভারতের প্রগতি, বিশেষ করে নারী-প্রগতি সম্বন্ধে। উদাহরণও দিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলার।

ভাষণ-শেষে সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করলেন কিছু বলার জন্যে। ফলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

পরণে তাঁর হংস-শুভ্র শিল্কের শাড়ী, দেহে তাঁর তেমনি শায়া-ব্লাউস : বাম-হাতে তাঁর রিষ্টওয়াচ, ডান-হাতে সোনার একটি কারুময় কঙ্কন : কণ্ঠে তাঁর আভিজাতিক নেকলেস, কর্ণে তাঁর মুক্তাময় কুণ্ডল। এই পোযাক-বিভূষিতা পেশল পরিপুষ্ট সুঠাম স্বর্ণকান্তি দেহে তিনি যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত গ্রীক-ভাস্কর্যের কোনো নিটোল নারী-মূর্তি।

তাঁর দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে পড়ল দীর্ঘপ্রকম্পিত মুগ্ধ হাততালি।

আর সবিনয় সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর সৌজন্য।

আবার সেই দীর্ঘ হাততালি—বিমুগ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস।

যোড়-করের আর শ্রদ্ধাপূর্ণ হাসির অভিনন্দন নিতে নিতে এবং হাতে মুখে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে তার প্রতি-অভিবাদন দিতে দিতে অবশেষে তিনি এসে উঠলেন তাঁর কারে।

কিন্তু তাঁর পেছনে-পেছনে তাঁর পাশে এসে বসলেন দীর্ঘ দেহাকৃতির বলিষ্ঠ এক তরুণ সুপুরুষ,—যেন সকলেরই অলক্ষ্যে। যেন কেউ তাকে দেখতে চায়নি, দেখবার প্রয়োজনবোধও করেনি।

কার থেকে নেমে দুজনেই প্রবেশ করলেন শয়ন-কক্ষে। একটা আরাম চেয়ারে হাত-পা মেলে আরাম করে বসলেন রঞ্জিতা। তারপর স্বামীকে শুনিয়ে বললেন, 'আজকের সম্বর্ধনাটি বেশ লাগল আমার, তোমার লাগল ক্যামন ?'

অপূর্ব তখন স্যুট বদলে পায়জামা, পাঞ্জাবী পরছিলেন। কোনো কথা না বলে একটু পরে রঞ্জিতার পাশের আরাম চেয়ারটায় অবসন্নে এলিয়ে পড়লেন। তারপর চোখ বুজে 'আঃ' বলে হাত দুটোকে মাথার উপর দিয়ে শিথিল ভাবে ছড়িয়ে দিলেন, আরাম এবং স্বস্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল তাঁর নিঃশ্বাসে। এতোক্ষণ যেন তিনি জেলের সেলে ছিলেন।

'বলোনা, ক্যামন লাগল।' একটু আবদারের সুরে বললেন রঞ্জিতা।

'ভালো' তেমনি চোখ বুজে নির্লিপ্ত উত্তর দিলেন অপূর্ব।

স্বামীর উদাসীন নির্লিপ্ত ভাবটা লক্ষ্য করে রঞ্জিতা সুড়সুড়ি দিয়ে বসলেন তাঁর কটিতটে।

'আঃ! করছ কী!' চমকে চোখ খুলে চাইলেন স্ত্রীর দিকে।

'আজ তোমার কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন?'

'কথা তো বলছি।'

'ওরই নাম কথা বলা। বলো না আজকের সম্বর্ধনাটা ক্যামন লাগল।' কণ্ঠে সেই আবদার।

'বোরিং' তেমনি উদাসীন উত্তর।

'বোরিং!' একটু বিস্মিত হলেন রঞ্জিতা। 'ক্যামন চমৎকার গান, অভিনয়, বক্তৃতা, আমার তো বেশ লাগল।'

'তোমার তো বেশ লাগবে, নিজের চাটুকারিতা শুনতে কারো খারাপ লাগে না।'

মুহূর্তে স্বামীর মর্ম-বেদনা উপলব্ধি করলেন রঞ্জিতা। স্তব্ধ চিত্তে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন; কিন্তু ব্যাপারটাকে লঘু করে তোলার জন্য সঙ্গে সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে উঠলেন, 'ওঃ! এই। না, ওঠ। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে যাই চল।' বলে নিজে উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বামীর হাত ধরে তাঁকেও তুলে দাঁড় করালেন।

কাছে বসে আজকে যত্ন করে স্বামীকে খাওয়ালেন রঞ্জিতা। তারপর নিজে খেয়ে এসে দেখলেন এরই মধ্যে স্বামী তাঁর শুয়ে পড়েছেন। স্বামীকে দেওয়ালের দিকে চুপ করে পড়ে থাকতে দেখে পালঙ্কে উঠে চুপি চুপি মশারি পাস্তিয়ে দিলেন। তারপর ঠিক হয়ে বসে স্বামীর কটিদেশে কাতুকুতু দিলেন।

'আঃ! আজ তোমার হয়েছে কী! ঘুমুতে দেবে না?' চিত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন অপূর্ব।

'বা-ব্-বা! কী যে কুম্ভকর্ণের ঘুম পেয়েছ? আজকে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে কেন?'

'ঘুম পেয়েছে তাই।'

'হুঁ, ঘুম পেয়েছে! ঘুমুতে দিচ্ছি আর কী। একটা গল্প বলো।'

বিস্মিত নয়নে অপূর্ব তাকালেন স্ত্রীর চোখের দিকে। আর স্মরণ করতে লাগলেন গত কয় রাত্রির কথা—ওর তো কোথায় তার সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি; বরং সে যখন বলতে গেছে, ওই তো তাকে ক্লান্ত বলে থামিয়ে দিয়েছে। ওর আজ হলো কী, 'গল্প!'

'হ্যাঁ গো! গল্প। একটা বলো, বহুদিন তোমার মুখে গল্প শুনিনি।' চোয়ালে চেটো রেখে কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন রঞ্জিতা।

'এতো রাত্রে!'

'আজ রাতে ঘুমুব না, তোমাকেও ঘুমুতে দেব না। 'অমৃত তুলিব আজি দেহ মথি যাপি মত্ত রাত্রি।' প্রিয়চিকীর্ষু রঞ্জিতার মধুক্ষরা ওষ্ঠাধরে দুষ্ট হাসি, মৃগ-লোচনে বিমোহিনী দৃষ্টি।

দ্বিগুণ বিস্মিত হলেন অপূর্ব; কিন্তু কোনো কথা বললেন না, শুধু বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

'লক্ষ্মীটি! বলো একটা গল্প। কলকাতা থেকে এবার নতুন যে বইগুলো এনেছ, তার একটাও তো পড়তে সময় পাচ্ছি না। তারই মধ্যে একটা ভালো গল্প বলো।'

'তুমি আজ পরিশ্রান্ত। রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। আজকে শুয়ে পড়ো, কালকে বলবো।'

সত্যিই রঞ্জিতা আজ পরিশ্রান্ত। আদালতে এক খুনী আসামীর বিচার করেছেন। তারপর সম্বর্ধনায় কয়েক ঘণ্টা ঠায় বসে কাটিয়েছেন। কিন্তু তথাপি তিনি জেগে থাকতে চান। স্বামীর অন্তরে যে-ব্যথাটুকু

আচম্বিতে তিনি দেখতে পেয়েছেন সেটুকু তিনি আজ রাত্রেই মুছে দিতে চান। স্বামীকে তিনি সুখী দেখতে চান, খুসী রাখতে চান।

ইঙ্গিতে নিজের পেশল বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়ে বললেন, 'এ শরীর খারাপ হবে না গো! বরং যতোটুকু জেগে থাকবো, ততোটুকু আমার লাভ।' প্রিয়াচিকীর্ষায় রঞ্জিতা আজ মদির। তাঁর কম্প্র-অধর ও মদিরাক্ষীতে সেই সঙ্কেত।

আর অবাক না হয়ে অপূর্ব শুধু বিমোহন নেত্রে নির্ণিমেষ তাকিয়ে রইলেন প্রিয়ার মুখপানে। আশ্চর্য! কী কোমলে-কঠিনে তৈরী রঞ্জিতা : দিনে সে শাসক—ভাগ্য-বিধায়ক , রাত্রে সে রঞ্জিকা—প্রীতিদায়িনী।

'অমন করে কী দেখছ।' আবার সেই কণ্ঠ।

'দেখছি তোমার নতুন রূপ আর—'

'আর—আর কী!' কণ্ঠে তাঁর আদিম কৌতুক। ম্যাজিস্ট্রেট রঞ্জিতা এখন প্রেয়সি রঞ্জিতা, মোহিনী-উর্বশী।

'আর—' বলে অপূর্ব গভীর অশ্লেষে তাঁর রক্তিম মধুবর্ষী অধরোষ্ঠের সন্নিকর্ষী হলেন। আর রঞ্জিতা স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গন-অশ্লেষে তৃপ্ত হয়ে অনুরাগে আঁখি মুদে পড়ে রইলেন! এক মদির আবেশে তাঁর তনু-লতা ভরপুর।

আলিঙ্গন শিথিল করে অপূর্ব বললেন, 'এবার শুয়ে পড়ো।'

দেহ-মনে পরশ পরিতৃপ্ত রঞ্জিতা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললেন; 'এই শুয়েছি। এবার গল্প বলো।' রঞ্জিতা যেন নব-বধূ, চির-বধূ, শুধু-বধূ, আর আজ যেন তার প্রথম বাসর-রাত্রি।

স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অপূর্ব বললেন, 'বেশ তবে শোনো —এক আধুনিক দম্পতির কথা।'

এক আধুনিক স্ত্রী নিজের খুশীমত তাঁর চলতি জীবন কাটানোয় তাঁদের মধুময় দাম্পত্য-জীবনে ধরেছিল যে-ভাঙন এবং সে-ভাঙন কীভাবে

মুছে গিয়ে আবার তাঁদের দাম্পত্য-জীবন মধুময় হয়েছিল তারই কাহিনী।

কিন্তু গল্প শেষ হওয়ার আগেই কে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেউ তা জানতে পারেন নি।

সে বছর চারেক আগের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিতর্ক-প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় 'পক্ষে' প্রথম হলেন পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র অপূর্ব রায়, আর 'বিপক্ষে' প্রথম হলেন রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্রী রঞ্জিতা বসু। এই দুই পক্ষ-বিপক্ষ, দুই প্রতিপক্ষ, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এই সর্বপ্রথম পরস্পর পরিচিত হলেন: পরিচিত হলেন জয়ের মধ্যে, গৌরবের মাধ্যমে—মুগ্ধ-চিত্তে। কিন্তু এই পরিচয় একদিন পরিণত হল প্রণয়ে, প্রণয় পরিণত হল পরিণয়ে।

পরীক্ষা-পাশের পর কথামত পরিণয়-পাশে বদ্ধ হলেন দুজনে। নীড়-রচন-পর্ব শেষ করে খাদ্যান্বেষণে গৃহ ছেড়ে বেরোলেন উভয়েই। বছর দেড়েক প্রাণপণ চেষ্টার পর চাকরী সম্বন্ধে হাল ছেড়ে যখন নিশ্চিন্ত হচ্ছিলেন অপূর্ব, এমনি সময়ে ভাগ্যবলে পশ্চিম ভারতের এক কলেজে দৈবাৎ জুটে গেল তাঁর দেড় শ' টাকার এক প্রফেসরী। কিন্তু রঞ্জিতা অচিরেই সরকারী চাকরী জুটিয়ে সেই বছরই এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে বসলেন। আই, এ, এস্, হয়ে তিনি স্বামীকে ধরে বসলেন, 'দাও না এই পরীক্ষাটা। গোত্রটা তাহলে দু'জনের এক হয়ে যায়। শিক্ষকের বউ শিক্ষয়িত্রী, অধ্যাপকের অধ্যাপিকা, ডাক্তারের লেডি-ডাক্তার। কর্মক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সমশ্রেণীর হলে দাম্পত্য-জীবনে কম্প্রোমাইজ আর য়্যাড্‌যাষ্টমেণ্ট চমৎকার হয়। তাছাড়া, দুজনেই আই, এ, এস্, হলে সুখে সংসারটা চালাতে পারবো, ছেলেমেয়েদের প্রপার এজুকেশন দিতে পারবো।'

'বাঃ! এরই মধ্যে হাকিম-মাফিক বড় বড় কথা বলতে আরম্ভ করেছ।

কিন্তু কথাটা কি জানো। আমি তো মেয়ে নয়, পরীক্ষা দিলেই পাশ হয়ে যাবে।

'মানে !—'

'মানে, চাকরীর ক্ষেত্রে ছেলেদের দিন তো শেষ হয়ে গেছে। এখন দিন তো পড়েছে তোমাদের।'

'হুঁ, তাতো বলবেই। কম্পিটিশনে হেরে যাচ্ছ, কাজেই দোষ হচ্ছে মেয়েদের। বেশ, কাপুরুষের মতো যদি কম্পিটিশনে নামতে না চাও, তবে বীরপুরুষের মতো প্রফেসরীটা ছেড়ে দাও।'

'প্রফেসরী ছেড়ে দেবো !' আকাশ থেকে পড়লেন অপূর্ব।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি থাকবে পশ্চিম ভারতে আর আমি থাকবো পূর্ব ভারতে—দুজনে থাকবো পৃথিবীর দু-প্রান্তে। কী চমৎকার !'

'কেন তাতে ক্ষতি কী !'

'আহা ! আমার 'অমিত রায়' রে !. তুমি থাকবে গঙ্গার ওপারে, আমি থাকবো এপারে। আমাদের মিলন হবে সেই পূর্ণিমা রাতে গঙ্গার বোটে ! আহা ! ছেলে যেন আমার কিচ্-ছু বোঝে না।' স্বামীর চিবুক নেড়ে কটাক্ষ হানলেন মদিরেক্ষণা রঞ্জিতা।

তারপর হাফ্ পেজ ফুলস্ক্যাপ কাগজে খস্-খস্ করে কী লিখলেন। লেখা শেষে স্বামীকে বললেন, 'এখানে সই করো।'

'সই ! কেনো !'

'বলছি করো। আবার কেনো কী ? ম্যাজিস্ট্রেটের কথার উপর কথা বলতে এসো না। জেল-জরিমানা হয়ে যাবে।'

ফলে যান্ত্রিক অপূর্ব সই করলেন নিজের পদত্যাগ পত্রে।

খামে ভরে লেখাটি চাকরের হাতে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলেন রঞ্জিতা। 'যাক্ ! এতোক্ষণে শান্তি পেলাম। ক'দিন ধরে এটা আমাকে যা ভাবিয়ে তুলেছিল।'

'বহুকষ্টে পাওয়া চাকরীটা তুমি এইভাবে ছাড়িয়ে দিলে।' ব্যথায় ও দুঃখে কথাটা বললেন অপূর্ব। 'তবে আমি এখন কী করবো।' নির্বোধের মতো কথা বলে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর চোখের দিকে।

'তুমি মোর মালঞ্চের হবে মালাকার।' হঠাৎ খল্খলিয়ে হেসে উঠলেন রঞ্জিতা। 'তুমি আমার মালাকার হবে গো, মালাকার। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে—যেমন মাথার সঙ্গে টিকি ঘুরে বেড়ায়।' ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা দুলিয়ে আবার অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ হানলেন মদিরাক্ষী রঞ্জিতা।

আর সেই থেকে মালাকার অপূর্ব রায় টিকির মতোই কথান্তরে বেণীর মতোই স্ত্রীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে সম্প্রতি এখানে এসে পড়েছেন। এখানে এসে হাঁপিয়ে পড়েছেন সহধর্মিনীর সম্বর্ধনা-সভায় লেডি ম্যাজিস্ট্রেটের 'কনসর্ট-'রূপে যোগ দিতে দিতে। কিন্তু রঞ্জিতা এস্-ডি-ও থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে প্রথম এই জেলায় এসেছেন, —এসে এই সম্বর্ধনা পাওয়ায় খুশীতে কাণায় কাণায় উপচে উঠেছেন।

কিন্তু সম্বর্ধনা সভাগুলোয় সবচেয়ে যেটা রঞ্জিতার চোখে পড়ল, সেটা হল এখানের মেয়েদের অনগ্রসরতা। সভাগুলোয় দু'একজন বালিকা ছাড়া মেয়েদের কোনো অংশ গ্রহণ করতে তিনি দেখেন নি, মহিলাদের উপস্থিতির নগণ্যতাও তাঁর চোখ এড়ায় নি।

কিন্তু বিস্ময়ে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন নাগরিক সম্বর্ধনায় থিয়েটার দেখে।

অভিনয় হচ্ছিল 'সীতার বনবাস।' আর দৃশ্যপটগুলি ছিল সত্যিই ত্রেতাযুগের। ফলে পটের দৃশ্যরাজি বনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে কলি আরম্ভের আগেই, শুধু পটগুলি কায়ক্লেশে কোনো রকমে টিকে রয়েছে

এই শেষ-কলি পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির হল-ঘরে। কিন্তু রঞ্জিতা আৎকে উঠলেন সীতার কণ্ঠস্বর শুনে। সে কী অপূর্ব কণ্ঠ—একেবারে বাজখাই আওয়াজ! আর সীতাহরণ-দৃশ্যে সীতা সত্যিই মরদের মতো কাজ করলে,—গোঁফ-দাঁড়ি কামানো সীতা যা বাজখাই চীৎকার-কান্না জুড়লে তাতে তিনি হেসে লুটিয়ে পড়বার উপক্রম করছিলেন; কিন্তু নিজের পদমর্যাদার কথা স্মরণ করে রুমালে ওষ্ঠাধর চেপে ধরলেন। অভিনয়টা তাঁর কাছে অষ্টাদশ শতকের যাত্রার অসভ্যতা মনে হল। আর এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তিনি অনেক রঙ্গ-পরিহাসও করলেন। কিন্তু এই অসভ্যতা প্রতিকারের জন্য তিনি উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন এবং ভেবে-ভেবে অবশেষে ঠিক করলেন এখানের মেয়েদের চেতনা উদ্বুদ্ধ করানোই এর সমাধানের একমাত্র পন্থা।

যা ভাবা সেই কাজ। পরদিনই তিনি নেমে পড়লেন তাঁর এই কাজে। বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দের গৃহিনীদের নিয়ে এক সভায় আলোচনা করলেন। স্বয়ং সভানেত্রী এবং এস, ডি, ও সহধর্মিনীকে সম্পাদিকা করে স্থাপন করলেন 'নারী-প্রগতি সংঘ,' সংঘের কার্যবিধির প্রথমটি হল স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তর-করণ, দ্বিতীয়টি স্থানীয় কলেজে কো-এডুকেশন প্রবর্তন, তৃতীয়টি 'রবীন্দ্র-স্মৃতি-মন্দির' প্রতিষ্ঠা। আবার রবীন্দ্র-স্মৃতি-মন্দিরে থাকবে নানা বিভাগ,—পাঠাগার, সঙ্গীত বিদ্যালয়; আর থাকবে মধ্যে একটি প্রকাণ্ড হল—যেখানে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হবে সভা-সমিতি-অভিনয় ইত্যাদি। অর্থাৎ রবীন্দ্র-স্মৃতি-মন্দির হবে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি চেষ্টা করবেন উপর থেকে—অর্থাৎ সরকার থেকে এবং সম্পাদিকা চেষ্টা করবেন ভিতর থেকে—অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে 'ডোনেশন' তুলে। আর অন্যান্য মেম্বরগণ তাঁদের উভয়কে করবেন যথাসাধ্য সাহায্য।

একাই একশ' সেজে বছর দু'য়ের প্রাণপণ চেষ্টায় রঞ্জিতা সুসম্পন্ন করলেন তাঁর এই বিরাট পরিকল্পনা-এয়।

পরিকল্পনা সম্পন্ন করে সৃষ্টির সেই আদিম আনন্দে রঞ্জিতা যখন ফুরসুতে মাথা তুলে চাইলেন, তখন এই সহরের জীবনে ঘটে গেছে যুগান্তর, তাঁর নিজের জীবনে রূপান্তর, আর অপূর্বর জীবনে একেবারে জন্মান্তর।

আজকাল সকাল-সন্ধ্যায় মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কিংবা নিজেরা একা একা বা দলে দলে মাঠে ময়দানে বেড়াতে বেরোচ্ছে, মার্কেটিং করছে। তরুণীরা প্রজাপতি সেজে বই হাতে স্কুল কলেজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে; মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসায় পুরুষরাও খেলার মাঠে, সিনেমার হলে, ক্লাব-ঘরে, চায়ের দোকানে, পথে-মাঠে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছে।

আর এদিকে পরিকল্পনা পূর্ণ করতে গিয়ে রঞ্জিতা যতো এগিয়ে গেলেন, ততো পিছিয়ে ফেলে গেলেন তাঁর সংসারকে, তাঁর স্বামীকে। সকাল ভোরে বেরোতেন চাঁদা সংগ্রহ করতে, গৃহ-নির্মাণ-রত কুলিদের কাজ দেখতে। এসে চটপট খেয়ে-দেয়ে চলে যেতেন কোর্টে; বিকেলে এ-মিটিং সে-মিটিং ইত্যাদি ইত্যাদি সেরে বাড়ী ফিরতেন রাত নটা-দশটায়। কাজেই সংসার বা স্বামীর দিকে নজর দেবার তাঁর সময়ই বা থাকতো কোথায়! অস্ত্র-পরীক্ষার্থী অর্জুনের মতো তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে শুধু একস্থানে, একদিকে; তা শুধু নারী-প্রগতি সংঘের কাজ, শুধু কাজ, রাত-দিন কাজ—তিনি যেন হয়ে উঠলেন একান্তই কর্মের মজুর। আর এর যে রেখা অঙ্কিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ-মণ্ডলে, তাতে যেন লিপিবদ্ধ হয়ে উঠল এক নতুন ইতিহাসের সঙ্কেত।

আর তাই যেন তাঁর প্রয়োজন মিটে গেছে অপূর্ব রায়ের, তাঁর স্বামীর, একটি পুরুষের,—একটি পুরুষের নিকটতম আসঙ্গর।

আর এই দু'বছর অপূর্ব রায়, প্রথম শ্রেণীর এম, এস-সি অপূর্ব রায়, পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক অপূর্ব রায়, পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চির দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষ অপূর্ব রায় ঘরের মধ্যে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, হাই তুলে, ঘুমিয়ে, পাশ ফিরে, পায়চারি করে, সিগারেট টেনে, নাটক নভেলের পাতা উল্টিয়ে, সংবাদ-পত্রের সংবাদ, কর্মখালি, পাত্র-পাত্রী, শেয়ার-মার্কেট, সভা-সমিতি, বেতার-জগৎ, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, খেলা-ধূলা, সিনেমা-থিয়েটার, তেল জুতোর বিজ্ঞাপন পড়ে পড়ে কাটিয়েছেন; কাজেই তাঁর পদার্থ এবং পৌরুষ ধীরে ধীরে কখন কী ভাবে যে উবে গেছে, তা তিনি নিজেই জানেন না। তিনি এখন আর পদার্থ নয়, 'অপদার্থ' : পুরুষ নয়, 'নঞ্ তৎপুরুষ'।

অবশ্য তাঁর এই অপূর্ব নামকরণ করেছে কলেজের এক রসিক ছেলে।

নারী-প্রগতি সংঘের পরিকল্পনা নিয়ে রঞ্জিতা যখন মেতে উঠলেন, তখন স্বামীকে নিয়ে বিকেলে তাঁর আর বেড়াবার সময় হয়ে উঠল না। অথচ তার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন রুটিন-মাফিক বিকেলে স্বামীকে পাশে বসিয়ে তিনি দীর্ঘ ড্রাইভ দিতেন কিংবা দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে বেড়াতেন; তারপর উভয়ে গল্প-গুজবে, হাসি-তামাসায়, কিংবা বই পড়ে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতেন।

আর এখন!

এখন রঞ্জিতার সময় না থাকায় স্যুট এঁটে, মাথায় ফেল্টের টুপি পরে, মুখে পাইপ টেনে, হাতে ছড়ি ধরে, সঙ্গে আলসেসিয়ান কুকুর নিয়ে অপূর্ব একা একা বেড়াতে বেরোন। আর নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাটা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেন।

এইভাবে একদিন যখন তিনি বেড়াচ্ছিলেন, তখন সেখান দিয়ে সাম্যবাদী রাজনীতির সমর্থক কলেজের কয়েকজন ছাত্র যাচ্ছিল। তারা

কংগ্রেস-সরকার কী ভাবে ধনী-তোষণ, গরীব-শোষণ নীতিতে দেশকে ক্রমশঃ চরম দুঃখদুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সে আলোচনায় রাস্তা গুলজার করে চলছিল। এমন সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে একজন আস্তে বলে উঠল, 'এই চুপ, ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বামী যে রে! শুনতে পেলে ওনাকে বলে দেবেন ; তারপর ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পচাক!'

সবাই অপূর্বর দিকে তাকাল। কিন্তু ব্যঙ্গ-নাট্য লেখক ব্যোমকেশ বলে উঠল, 'স্বামী কী রে! ম্যাজিষ্ট্রেটের বউ তো! স্বামী মানে তো প্রভু, পালক, রক্ষক, মালিক। ম্যাজিষ্ট্রেট তো ওঁর প্রভু, পালক রক্ষক, মালিক—সবই। কাজেই উনি আর মিষ্টার নন, মিসেস ঃ মিসেস অপূর্ব বোস।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল, কিন্তু সেই আগের ছেলেটি যেন তার একটা ভুল শুধরাতে চাইল, 'বোস নয় রে, রায়।'

'ওটা তো ওঁর প্রাক্-বিবাহ জীবনের পদবী। উনি তো তাঁকে বিয়ে করেননি, তিনি ওঁকে বিয়ে করেছেন ; কাজেই উনি তো তাঁর পদবী পাবেন।'

আবার সেই হাসি।

কথাগুলো উড়ো-উড়ো কানে যাচ্ছিল অপূর্বর। তিনি ওদের দিকে ফিরে তাকালেন। তাকাতেই ব্যোমকেশরা কথা বন্ধ করে দ্রুত অন্যদিকে সরে পড়ল।

আর একদিন এমনি এক উত্তপ্ত আলোচনাকালে তাঁকে দেখতে পেল ব্যোমকেশের দল, 'সাহেব যে রে!'

'চলার ভঙ্গি ভ্যাখ্। যেন লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে চলেছেন জন বুল।'

'জন বুল নয় রে! পিলপিলি সাহেব। সিনেমা দেখিস্ নি।' ব্যোমকেশ টিপ্পুনি কাটল

কথা ও হাসি দুটোই পরিষ্কার কানে গেল অপূর্বর। তাঁর ইচ্ছা হল ঘা কয়েক সপাং সপাং চাবুক মারেন এই ইতর ছেলেদের পিঠে কিংবা কুকুরটা লেলিয়ে দেন। কিন্তু সাহস পেলেন না,—হয়তো পরদিন স্ত্রীর এজলাসে তাঁকে আসামীরূপে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তার চেয়ে চুপ করে ফিরে যাওয়াই ভাল, আর তাই তিনি করলেন।

আর এরপর স্যুট ছেড়ে ধরলেন ধুতি-পাঞ্জাবী। কিন্তু তাতেও রেহাই পেলেন না। ব্যোমকেশের দল দেখতে পেয়েই বলে উঠল, 'সাহেব যে কবি হয়ে উঠছেন!'

'মাথায় তাহলে কিছু পদার্থ আছে।'

'কিচ্ছু নেই। যদি পদার্থই থাকতো, তাহলে পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এমন অপদার্থ হতেন না।' একটু থেমে ব্যোমকেশ আবার বলে উঠল, 'কিন্তু রঞ্জিতা দেবী রসায়ণের ছাত্রী হয়ে এমন বেরসিকা হলেন কি করে! একটা অপদার্থকে বিয়ে করলেন!'

কথাটা কানে যেতেই কর্ণমূল লাল করে অপূর্ব সোজাসুজি বাংলোর দিকে ফিরলেন এবং কোন দিকে না চেয়ে দ্রুতপদে পালাতে লাগলেন।

আর তা দেখে ব্যোমকেশ আবার বিদ্রূপ করে উঠল, 'ত্থাখ্ ত্থাখ! আমাদের দেখে বেচারা ভয়ে ছুটছে। পুরুষ নয় রে, নঞ্‌তৎপুরুষ!'

অপূর্বর এই অপূর্ব নাম আর বিশেষণগুলি ক্রমশঃ কলেজে চালু হয়ে গেল। সেখান থেকে সংক্রামক রোগের মত প্রসারিত হল খেলার মাঠে, চায়ের আড্ডায়, বাড়ীর বৈঠকে, আর শেষ পর্বে অন্দর-মহলে।

অপূর্ব রাস্তায় বেরোলেই তাঁকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বকাট ছেলেরা এই বিশেষণগুলি ছুঁড়ে পরস্পরকে ব্যঙ্গ করে, শুধু অপূর্ব নামটি বদলে তাদের আসল নাম জুড়ে দেয়। ফলে অপূর্ব বাংলোর বাইরে বেরনো বন্ধ করে

দিলেন; সকাল-বিকেল শুধু বাংলো-সন্নিহিত প্রাঙ্গণে পায়চারি করেন।

ক্রমশঃ অপূর্ব অসহ্য হয়ে উঠলেন। ওঃ! আর এ সহ্য করা যায় না! তিনি মরিয়া হয়ে একদিন রঞ্জিতাকে মিনতি মিশিয়ে বলে বসলেন, 'রঞ্জু, এখানে আমার শরীরটা তেমন আর ভালো যাচ্ছে না। তুমি—

'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না!' অবাক হলেন রঞ্জিতা, 'খাচ্ছ দাচ্ছ বেড়াচ্ছ, ভালো না যাবার তো কোনো কারণ নেই। ডাক্তার ডাকব!'

'না, তুমি ট্রানস্‌ফার নাও।' একটু বলিষ্ঠ হয়ে অসমাপ্ত কথা শেষ করলেন অপূর্ব।

'ট্রান্‌স্‌ফার!' আঁৎকে উঠলেন রঞ্জিতা, 'ট্রান্‌স্‌ফার হলে বরং তা বন্ধ করতে হবে। আমার আরব্ধ কাজ এখনো শেষ হয় নি। পঁচিশে বৈশাখ এসে গেল, এখনো সব কাজ গুছিয়ে উঠতে পারি নিঃ লাইব্রেরীর বইগুলো এসে পৌঁছয়নি, সঙ্গীত বিদ্যালয়টা ঠিকমত চালু হচ্ছে না।' বজ্রি ঘড়িতে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'এঃ! রিহার্সেল আরম্ভ হয়ে গেছে, আমাকে এখুনি যেতে হবে। না, তুমি এখন একটু বেড়িয়ে এসো দেখি। ঘরের মধ্যে কুনো হয়ে বসে থাকলেই তো শরীর খারাপ হবে।' ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়ে বিমর্ষ স্বামীর চিবুকটা নেড়ে দ্রুতপদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন রঞ্জিতা।

অপূর্ব কাঠ হয়ে গেলেন। সমাহিতের মতো স্ত্রীর পদক্ষেপের দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

ঢং করে ঘড়িতে শব্দ হতে তিনি চমকে শিউরে উঠলেন,—তাঁর সম্মোহনের ভাবটা কেটে গেল। গা ঝাড়া দিয়ে পকেট থেকে বের করলেন গোল্ডফ্লেক সিগারেট। সিগারেটটায় টান করে টান দিতে লাগলেন। আর টান দিতে দিতে তিনি যেন অকস্মাৎ জেগে উঠলেন। তাইতো! যে কথাটা বলার জন্য তিনি আজ বহুক্ষণ প্রস্তুত হয়েছিলেন,

সে কথাটা তো রঞ্জিতাকে তাঁর বলা হয় নি! আশ্চর্য! আশ্চর্য হলেন তিনি নিজের উপর। রঞ্জিতাকে আটকিয়ে তাঁর সব কথা বলা উচিত ছিল। কেন তিনি তা পারলেন না। নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়েছে! তিনি বাম হাতে ডান হাতের নাড়ী টিপে ধরলেন। তাইতো! নাড়ী তো তার দ্রুত চলছে! কপালে হাত বুলিয়ে দেখলেন ঘাম বেরুচ্ছে। ঘাম মুছে কপালটা টিপে চোখ বুজে এলিয়ে পড়লেন কোচে—যেন তিনি সত্যই ভয়ানক দুর্বল।

'ছাখো, কে এসেছেন।'

কতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিলেন অপূর্ব, তা তিনি নিজে জানেন না। স্ত্রীর কথায় চোখ মেলে চাইলেন। না-চাইলে বরং তিনি বেঁচে যেতেন; কিন্তু যখন চেয়েছেন তখন আর বোজাতে পারলেন না। দেখতে হলো কে এসেছেন। রঞ্জিত কর! উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারের পুরো-ইউনিফর্মে রঞ্জিত কর! যেন যমদূত!—যমরাজের শমন নিয়ে হাজির তাঁর শিয়রে!

'নমস্কার অপূর্ববাবু, বহুদিন পরে দেখা হল। ক্যামন আছেন।' রঞ্জিতার নির্দেশে অপূর্বর সামনের কোচটায় বসতে বসতে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলেন রঞ্জিত। ফলে সৌজন্যে সোজা হয়ে বসতে গিয়ে কুঁকড়ে গেলেন অপূর্ব, তারপর ঠোঁটে হাসি টেনে জোড় হাত তুলে বললেন, 'এই একরকম।'

আলাপ আলোচনায়, গল্প-সল্পে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে রঞ্জিত উঠতে তাঁকে এগিয়ে দিতে গেলেন রঞ্জিতা। তারপর হাত-মুখ ধুতে ঢুকলেন বাথ-রুমে। আর অপূর্ব মোহগ্রস্তের মতো চোখ বুজে তেমনি আবার এলিয়ে পড়লেন কোচে।

রঞ্জিত কর! পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটে কেমেষ্ট্রির সেই লাজুক, মুখচোরা, স্বল্পভাষী নিরীহ মেয়েলী রঞ্জিত কর—আই, পি, এস! এস, পি! না,

আর ভাবতে পারেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র ডিবেটার শ্রেষ্ঠ 'স্মার্ট বয়' অপূর্ব রায়!

কেমেষ্ট্রি অনার্সের ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট যে রঞ্জিত কর ফার্ষ্ট ক্লাস সেলেও রঞ্জিতা বসুকে এম, এস-সি ক্লাসে প্রথম-দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিল, যে-রঞ্জিত কর রঞ্জিতার কাছে বই চাইতে গিয়ে নোট, নোট চাইতে গিয়ে বই চাইত, যে রঞ্জিত করের রঞ্জিতার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে গলায় অর্ধেক কথা আটকিয়ে যেত আর কপালে ঘাম চুইয়ে পড়ত, যে-রঞ্জিত করের মেয়েলী স্বভাবের জন্য রঞ্জিতা করুণা ও কৌতুক বোধ করত— সেই রঞ্জিত কর আজ পুলিশের ঊর্ধতন অফিসার, সে আজ এতো বাক্-চতুর! 'যে-মেয়েকে ভালোবেসে ধরতে চাই, সে যে পিছলে অন্যের কাছে সরে যায়।' বিয়ে করে না কেন রঞ্জিতার প্রশ্নের উত্তরে এই তার জবাব! রঞ্জিতার দিকে চেয়ে হেসে হেসে এ কথা বলার মানে কী! 'তাই বিয়ে করবো না।' বিয়ে করবে না বলেই কী রঞ্জিতার অনুসন্ধান করে এখানে পোষ্টিং নেওয়া! রঞ্জিতার স্বামী অপূর্ব রায় আর ভাবতে পারেন না। কপালটা আরো জোরে টিপে ধরে চোখ বুজে তেমনি নিঝুম পড়ে রইলেন।

কিন্তু পঁচিশে বৈশাখ সকালে তাঁর সে ঝিমুনিটা হঠাৎ কেটে গেল।

পাশ বালিশ বুকে চেপে কাৎ হয়ে অপূর্ব পড়ছিলেন রবীন্দ্র জন্মোৎসবের কার্য-সূচি। দামী আর্টপেপার ছাপান অষ্টাহব্যাপী দীর্ঘ কার্য-সূচি। বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতদের বাঙলার নাম করা সাহিত্যিকবৃন্দের নাম তাতে ছাপান। কেউ সভাপতি, কেউ প্রধান অতিথি, কেউ মূল বক্তা। সকালে-বিকালে দুবেলাই চলবে অধিবেশন। প্রতি অধিবেশনে নতুন সভাপতি, নতুন অতিথি, নতুন বক্তা। এছাড়া রয়েছে সঙ্গীতকার, সঙ্গতকার ইত্যাদি নানা জনের নাম। সূচীর প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে অধিবেশনের মূল সভাপতি

শান্তিনিকেতনের ডাঃ সেনের এবং শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে রবীন্দ্র-স্মৃতি-মন্দিরের সভানেত্রী ও সম্পাদিকার নাম। অপূর্ব উল্টে-পাল্টে বার বার তা দেখছিলেন আর পড়ছিলেন এবং ভাবছিলেন এই সমারোহ সমারম্ভের মুখ্য অধিকর্ত্রী আপন সহধর্মিনীর অন্তর্লোকের কথা।

এমন সময় সেজে-গুজে ব্যস্তসমস্ত ভাবে রঞ্জিতাকে বেরিয়ে যেতে দেখে হঠাৎ কী জানি কি হল তিনি সোজা হয়ে বসে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে থমকে রঞ্জিতা স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একী ? এ কথা তো তিনি কখনও স্বামীর মুখে শুনেননি, স্বামীর এ কণ্ঠ-স্বরও তাঁর কানে কখনও যায় নি ! এ কথায় কণ্ঠে যে কৈফিয়তের সুর ! কিন্তু সামলে নিয়ে সহজ হয়ে বললেন, 'ষ্টেশনে। শান্তি-নিকেতনের ডক্টর সেন আর অধ্যাপকরা এই ট্রেনে আসবেন, তাঁদের 'রিসিভ' করতে।'

'যেতে পাবে না।' কঠিন কণ্ঠে অপূর্ব যেন তাঁর স্বামীত্ব জাহির করতে চাইলেন।

বিনা-মেঘে, এই মুহূর্তে সামনে যদি বজ্রপাত হোতো কিংবা বিনা ভূমিকম্পে এই মুহূর্তে এই পোক্ত দালানটা যদি চুরমার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, তাহলে রঞ্জিতা যতো না বিমূঢ়-বিস্মিত হতেন স্বামীর এ কথায় তার শতগুণ বিমূঢ়-বিস্মিত হলেন। তাঁর মনে হলো আশি মাইল স্পীডে একটি মোটরকার পিছন দিক থেকে হঠাৎ তাঁকে ধাক্কা মেরেছে, আর তিনি যেন ছিটকে পথ-প্রান্তের ধূলায় লুটিয়ে আর্তনাদ করছেন। কিন্তু এবারও সামলে নিয়ে বললেন, 'মানে !—'

'যেতে পাবে না মানে যেতে পাবে না।' কঠিন হয়ে উঠল অপূর্বর মুখটা।

'শরীর তোমার সত্যি খারাপ হলো না কী !' এগিয়ে স্বামীর কপালে হাত দিলেন রঞ্জিতা।

‘ন্যাকামী রাখো।’ অবজ্ঞায় হাতটা তাঁর ঠেলে দিলেন অপূর্ব।

‘ন্যাকামী!’ চাবুক খেয়ে যেন আঁৎকে উঠলেন রঞ্জিতা।

‘ন্যাকামী নয় তো কী। জেনে-শুনে যদি চুপ করে থাকো।’

‘কী জেনে-শুনে চুপ করে আছি!’

‘আমার দুর্নাম।’

‘তোমার দুর্নাম!

‘জেনে-শুনেও আবার না-জানা-শোনার ভান!’ অপূর্বর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

‘কী জেনে-শুনে আবার না জানা-শোনার ভান করছি। দোহাই তোমার, খুলে বলো।’ পৃথিবীটা যেন তাঁর চোখের সামনে ঘুরছে।

উত্তেজনায় অপূর্ব বলে গেলেন ব্যোমকেশের দেওয়া তাঁর নতুন নাম আর বিশেষণগুলি। বলা-শেষে বললেন, ‘এ-সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এসব-কথা জানে, আর শুধু তুমি জানো না।’ আবার ব্যঙ্গ করে উঠলেন অপূর্ব।

সত্যিই রঞ্জিতা এ সব কথা কিছুই জানেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁর স্বামীর এই দুর্নাম জানাবার সাহস কারই বা থাকতে পারে। তাছাড়া, শক্তি-খ্যাতি-প্রতিপত্তির তুঙ্গ-শীর্ষে তিনি অধিষ্ঠিতা; এসব তুচ্ছ কথা জানবার বা শোনবার তাঁর অবসর কোথায়! কিন্তু স্বামীর মুখে তাঁর নিজের অপযশ শুনে বেদনায় সত্যিই তিনি একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য কি যেন বলতে চাইলেন; কিন্তু স্বামীর অদ্ভুত আদেশে তা তাঁর মনে চাপা পড়ে গেল।

‘এখনই তোমাকে এ-সহর ছেড়ে যেতে হবে, এখনই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কলকাতায়। দাঁড়াও প্রস্তুত হয়ে নিই।’ এতোদিনের দাম্পত্যজীবনে আজকে এই সর্বপ্রথম অপূর্ব প্রকাশ করলেন তাঁর বাঙালি-স্বামীত্বের আসল রূপ।

এ-অপূর্বকে ইতিপূর্বে কোনোও দিন দেখেননি রঞ্জিতা। তাই

তিনি অবাক হলেন বটে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট রঞ্জিতা মোটেই ভয় পেলেন না। তিনি তাঁর ম্যাজিষ্ট্রেটী ধমকে বললেন, 'পাগলামী রাখ, তোমার সঙ্গে প্রলাপ বকবার সময় আমার নেই।' বলে পা বাড়ালেন।

পলকে অপূর্ব খাট থেকে একরকম লাফিয়ে নামলেন। তারপর রঞ্জিতার ডান হাত শক্ত করে ধরে সজোরে টান দিলেন। সে-টান রঞ্জিতা সামলাতে পারলেন না, স্বামীর গায়ের উপর এসে পড়লেন।

প্রায় গত দু' বছর অপূর্ব স্ত্রীর সান্নিধ্য পাননি, আর গেল কয়েকমাস তো তার দেহের সান্নিধ্য দূরের ক া এমন কি হাতের স্পর্শও পাননি। তাঁকে হাতের মুঠোয় পাওয়ায় অপূর্বর মুমূর্ষু পুরুষটি যেন সঞ্জীবনী স্পর্শে হঠাৎ সঞ্জীবিত হল। হঠাৎ যেন তাঁর মধ্যে আদিম পুরুষটি জেগে উঠল। তাঁর চোয়ালটা স্ফীত হয়ে ভয়ানক শক্ত হল, কপালের শিরা সাপের মতো ফুলে গেল, আর চোখ দুটো ক্ষুধার্ত শিকারী বাঘের মতো হিংস্র হল।

আর রঞ্জিতা! তিনি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন স্বামীর এই পুরুষটিকে। তাঁর সামনে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক বর্বর পশু-মানব, আর তিনি যেন সেই পশুর হাতে অসহায়া নিপীড়িতা মানবী।

এই নাটকীয় অবস্থায় কতক্ষণ তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে বাহ্য-জ্ঞানহীন হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা কেউ তা জানতে পারেন নি; কিন্তু উভয়ের সম্বিত ফিরে এলো রঞ্জিতের ডাকে, 'মিসেস রয়, ওঁরা এসে গেছেন।'

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করল উভয়েরই হতচকিত দৃষ্টি। পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশমান ইউনিফর্মে সশব্যস্ত রঞ্জিত। ক্লাস-ফ্রেণ্ড আর নিকট বন্ধুরূপে এ-বাড়ীতে তাঁর অবারিত দ্বার। 'ষ্টেশনে আপনার না-যাওয়ায় হঠাৎ আপনার কিছু হয়েছে মনে করে এসেছি। কিন্তু···বাট সরি—

ভেরি সরি।' হতভম্ব রঞ্জিতের কণ্ঠে অপ্রস্তুতের কুণ্ঠা। বাইরের ঘরে এঁদেরকে এ-অবস্থায় দেখবেন তিনি ভাবতে পারেননি।

লজ্জায় মরে গেলেও মুখে হাসি টেনে রঞ্জিতা সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নো নো, ডোন্‌ট বি সরি, চলুন।' বলে রঞ্জিতের হাত ধরে দ্রুত পদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আর অপূর্ব!

রঞ্জিতকে দেখেই অপূর্ব প্রাণ-ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁর হাত থেকে রঞ্জিতার হাত স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। কটিবন্ধে পিস্তলের উপর রঞ্জিতের ডান হাত দেখেই ভিতরে তাঁর কাঁপুনি সুরু হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে-কাঁপুনি বাইরে প্রকাশের পূর্বেই রঞ্জিত-রঞ্জিতার এই আকস্মিক আশ্চর্য নিষ্ক্রমণে তিনি পাথর হয়ে গেলেন। যেন মধ্যযুগের কোনো নিপুণ ভাস্কর-নির্মিত শ্বেত-প্রস্তরের নিখুঁত মনুষ্য-মূর্তি, যাদুঘরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দর্শনার্থীর অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তুরূপে।

কিন্তু পরিহাস এমনি যে বিকেলে অপূর্বকে যোগ দিতে হল রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে।

সকালের দুর্ঘটনাটা তাঁকে নির্বাক স্থবির করে দিয়েছিল। বিছানায় তিনি অসাড় অবস্থায় সময় কাটাচ্ছিলেন। বিকেলে রঞ্জিতা তাঁকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান আবেদন অনুরোধ অনুনয় করলেন, 'লক্ষিটি, আমার স্বামীর উপস্থিতি যে একান্ত প্রয়োজন। ওঠো।'

অপূর্ব পূর্ববৎ নিশ্চল নিশ্চুপ পড়ে রইলেন।

'এতো লোকের কাছে আমার মাথা কেটে দিও না। তোমার পায়ে পড়ি, ওঠো।' সাধারণ বাঙালি গৃহ-বধূর মতো বাষ্পাকুল হৃদয়ে স্বামীর পায়ে ধরে সাধলেন রঞ্জিতা।

যেন সাপিনীর ছোবল খেয়ে আতঙ্কে একশ' ষাট ডিগ্রি কোণের পাকে মুহূর্তে সামনে পেটের দিকে কুড়ি ডিগ্রি কোণে সঙ্কুচিত করে আনলেন অপূর্ব ; কিন্তু তেমনি নির্বাক পড়ে রইলেন।

স্তম্ভিতা রঞ্জিতা বাইরে রঞ্জিতের কণ্ঠস্বর শুনে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেলেন, 'আপনি এসে পড়েছেন, চলুন।'

'অপূর্ববাবু যাবেন না ?' সাধারণ সহজ ভদ্রতায় শুধালেন রঞ্জিত।

'না, ওর শরীরটা খারাপ, শুয়ে রয়েছে।'

'শরীর খারাপ না অভিমান।' রঞ্জিতের অধরোষ্ঠে কৌতুক হাসি। 'সকালের মান-অভিমান পালার জের তো।' রঞ্জিতাকে কথা বলার অবকাশ না-দিয়েই আবার বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়ান আমি দেখছি।' সঙ্গে সঙ্গে পর্দা তুলে ঘরে ঢুকলেন, 'কী হল আপনার। না উঠুন দেখি। কী যে আলসের মতো শুয়ে থাকেন।' বলতে বলতে একেবারে অপূর্বর খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অপূর্ব কম্প্র বক্ষে উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন রঞ্জিত-রঞ্জিতার আলাপ-আলাপন। কিন্তু রঞ্জিতের গৃহ-প্রবেশে তেমনি কম্প্র বক্ষে আর পাংশু মুখে তড়িতে উঠে বসলেন। না, ধুতি-পাঞ্জাবী-পরিহিত এ তো এম. এস-সি ক্লাসের সেই রঞ্জিত, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ডান হাতটা কেন ওর পকেটে! নিশ্চয়ই পিস্তলটা ওখানে রয়েছে! এখুনি তার বুক লক্ষ্য করে খুট করে টিপে দিতে পারে! প্রায় আঁৎকে শুষ্ক কণ্ঠে অপূর্ব বললেন, 'কিছু নয়. আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, আমি যাচ্ছি।'

কিন্তু সেখানে গিয়েও রেহাই পেলেন না অপূর্ব। ডায়াসের উপরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নির্দিষ্ট আসনে তিনি বসেছিলেন। বসে বসে নিরীক্ষণ করছিলেন উৎসবের সাজ-সজ্জা, জন-সমাবেশ ; আলাপ করছিলেন পরিচিতদের সঙ্গে। উৎসবের প্রাক্কালে চারদিকে ব্যস্ততা, বহুজনের আনা-গোনা, নানাপ্রকার কথা-বার্তা। কিছু বা তিনি

উপভোগ করছেন, কিছু বা দেখছেন, কিছু বা শুনছেন। এমন-সময় শন্-শন্ করে তীরের মতো বিঁধে গেল তাঁর কাণে একটা কথা। 'শ্রীমতী অপূর্ব বোস রে, ঐ বসে আছে।' ধাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন ডায়াসের এক কোণে দাঁড়িয়ে জনৈক ছেলে আঙ্গুল বাড়িয়ে তাঁকে দেখাচ্ছে, অন্য কয়েকজন উদগ্রীব কৌতূহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মুখ ঘুরাতেই তারা সরে পড়ল বটে; কিন্তু এখানে বসে রইবার ইচ্ছা অপূর্বর আর রইল না। না, এখানেও তাঁর বাঁচোয়া নেই। এদের এই জ্বালায় তিনি রঞ্জিতার সঙ্গে কিছুকাল যাবৎ সভা-সমিতিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বহুদিন পরে একটি সভায় আসায় মন্দ লাগছিল না তাঁর এ-উৎসবটি; কিন্তু এই এক কথায় সবই বিষিয়ে গেল। না, আর এখানে থাকা চলে না। কোনোরকমেই না। তাই এক সময় সুযোগ বুঝে বেরিয়ে গেলেন হল থেকে। তারপর সোজা দক্ষিণে খানিক গিয়ে ডায়মণ্ড ফুটবল গ্রাউণ্ডে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বেশ খানিকক্ষণ তিনি পায়চারি করলেন। তারপর একস্থানে জুতো খুলে ঘন ঘাসে হাত-পা মেলে বসে পড়লেন। আরো খানিক পরে শুয়ে পড়লেন। আর পূর্ণোদর গোল্ড-ফ্লেক কৌটোটিকে শূন্য করে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে চললেন।

কিন্তু তিনি মরে যেতে লাগলেন অন্তরের ধূমায়িত আগুনে—যে আগুন পুড়ে মারে না, শুধু তিলে তিলে দগ্ধে মারে।

শুক্লা-ষষ্ঠীর বুক-ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদ পশ্চিম আকাশে অবসন্নে হেলে পড়েছে। তবুও তার রূপালি জোছনায় মা-ধরিত্রীর সবুজ বুক স্নেহ-ধারায় প্লাবিত হয়ে চলেছে, গ্রাউণ্ড-সীমায় সারিবদ্ধ ঝাউগাছে একটানা সোঁ-সোঁ শব্দ এক অপূর্ব ঐক্যতান জুড়েছে। আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই দিকে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনের রূপালি পর্দায় ছায়া-ছবির মতো দ্রুতবেগে একে একে ভেসে যেতে লাগল তাঁর আপন জীবনের দৃশ্যগুলি। মনে পড়ল তাঁর পুষ্পিকাকে—তাঁর আরম্ভ-যৌবনের প্রথম প্রেমিকা। তাঁর বৌদির বোন পুষ্পিকা।

পুষ্পিকার ম্যাট্রিক পাশের পর তাঁর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্যে তাঁর বৌদি উঠে-পড়ে লেগে যান। তখন তিনি পড়ছিলেন বি. এস-সি। তাঁর এম. এস-সি পাশ না-করা পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁর বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। পুষ্পিকার বাবা তার সম্বন্ধ করতে লাগলেন অন্যত্র; কিন্তু তাঁর বৌদি একে একে সব সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছেন আদুরে বোনটিকে শুধু আদুরে দেবরের হাতে দেওয়ার জন্য, নিজের কাছে পাওয়ার জন্য।

তারপর অকস্মাৎ উল্কার মতো তার জীবনে এলো রঞ্জিতা। আর সে-উল্কার তীব্র-ছটায় তার চোখ গেল ঝলসে আর মন থেকে কোমল নরম পুষ্পিকা-পাঁপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তার মনে পড়ল, এমনি এক বৈশাখ-সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হল সন্নিহিত গড়ের মাঠের সেই নির্জন অংশে পুষ্পিকার আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে গভীর আবেগে তিনি বলেছিলেন, 'পুষ্প, এ আংটি তোমাকে কোনোদিন খুলতে দেবো না, এ আমাদের মিলন-গ্রন্থি। আজ থেকে আমরা এক হলাম।' অনুরাগে পুষ্পিকা তার বুকে মাথা রেখে তার মুখের দিকে নিশীথের মুক্তাবিন্দুর মতো প্রেম-মদির আঁখি-দুটি তুলে ধরেছিল।

তারপর...

তারপর সে আজ এখন বি-এ, বি-টি মিসট্রেস। অপমানে-লাঞ্ছনায়-ঘৃণায় প্রতারক পুরুষ জাতের কাউকে আর নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেয়নি।

সত্যি, সত্যিই তিনি প্রতারক, ঠক, প্রবঞ্চক।

আচম্বিতে তিনি চমকে শিউরে উঠলেন ঝাউগাছে ডেকে-উঠা একটা পাখীর কর্কশ কণ্ঠস্বরে। তার মনে হল কেউ যেন তাকে ডাকছে 'কে!' আতঙ্কে তিনি সেদিকে তাকালেন। তার চোখ গিয়ে পড়ল রবীন্দ্র-স্মৃতি-মন্দির-পথে মরে-যাওয়া গাছটার রয়ে-যাওয়া গুঁড়িটার উপর। তাইতো! কে যেন আসছে! ধপধপে পাঞ্জাবী পরা কে! লম্বা দীর্ঘ চেহারা! রঞ্জিত! রঞ্জিত না কী! কেন! কেন সে আসছে! তাঁকে দেখতে না পেয়ে কী তার অনুসন্ধান করছে! কেন সে তাঁর অনুসন্ধান করছে! সে কী তার পথের কাঁটা সরাতে চায়! এই নিশীথ নির্জন তো তার প্রশস্ত সময়! ধরা পড়বার ভয় নেই! গুলির শব্দে চক্রব্যূহ করে পুলিশ যদিই বা তাকে ধরে ফেলে এস, পি রঞ্জিতের তাতে কিছু যায়-আসে না! ম্যাজিষ্ট্রেট রঞ্জিতা এস-পি রঞ্জিতকে তো বেকসুর খালাস দেবেই! কেন না, সে যা করেছে সে তো তাদের নিজেদের মিলনের জন্যই!

না, আর ভাবতে পারেন না নার্ভাস অপূর্ব রায়। ভাববারও যেন আর সময় নেই। ঐ, ঐ না রঞ্জিত এগিয়ে আসছে! ধনুকের ছিলার মতো মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে লাগলেন বাংলোর দিকে।

আর এদিকে রবীন্দ্র গীত-বাদ্যে-নৃত্যে রবীন্দ্র স্মৃতি-মন্দির যখন হয়ে উঠে ছিল ইন্দ্রপুরী, এমন সময় রাত্রি দশটায় রঞ্জিতা পেল এক টেলিগ্রাম— ঘাসকুসুম সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের এক আমিনকে উত্তেজিত জনতা প্রাণে মেরে ফেলেছে, আর কানুনগো-সাহেবকে দিয়েছে বেদম প্রহার। সম্পাদিকার হাতে অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট দায়িত্বটুকু ছেড়ে দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ সদর এস-ডি-ও ও রঞ্জিতকে নিয়ে চলে গেলেন রঞ্জিতের কোয়ার্টারে। আলোচনায় ঠিক হল পরদিন প্রত্যূষে আর্ম ফৌজ নিয়ে তাঁরা তিনজনই যাবেন ঘাসকুসুমায়।

কথামত পরদিন প্রত্যূষে প্রস্তুত হয়ে তিনি বসেছিলেন রঞ্জিতদের

অপেক্ষায়। এমন সময় পেপার-ওয়েটে চাপা তাঁর নামে সাদা খামের একটা চিঠি টেবিলে তিনি দেখতে পেলেন। খামটা ছিঁড়ে লেখকের নাম দেখে তিনি কেঁপে উঠলেন। দমবন্ধ করে এক নিশ্বাসে পড়ে গেলেন। তাঁর স্বামীর লেখা ইংরেজিতে দীর্ঘ এক পত্র। পত্রের সার মর্ম :

দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর 'সোশ্যাল য়্যাণ্ড ফিজিক্যাল রিলেশন, ডিভিসন অব্ লেবার, ইকনমিক য়্যাড্ যাষ্টমেন্ট' সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে এক দীর্ঘ আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন তাঁদের দাম্পত্য-জীবনটা একেবারে 'টপসি-টার্ভি', অর্থহীন, শূন্যগর্ভ। শীতপ্রধান ইয়োরোপীয় সুস্বাদু ফলের বীজে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের মাটিতে উৎপন্ন বৃক্ষের ফল আমাদের অখাদ্য হয়ে উঠে যেমন; তেমনি ইয়োরোপীয় সামাজিক, আর্থিক, শ্রমবিভাগ বিধিকে ভারতীয় জীবনে চালু করলে যে বিষময় ফল ফলে, তার একটি চরম দৃষ্টান্ত তাঁদের যুগল-জীবন। অতএব, তাঁর অর্থাৎ লেডি-ম্যাজিষ্ট্রেটের কনসর্ট হয়ে থাকায় তাঁর নিজের জীবন যে কী ভীষণ ট্র্যাজিক, মর্মান্তিক, দুর্বিসহ তা তাঁকে বোঝানো তাঁর সাধ্যাতীত—আর ম্যাজিষ্ট্রেট রঞ্জিতার পক্ষেও তা বোঝা তো একেবারে সাধ্যাতীত। তাই তিনি ফিরে যাচ্ছেন দাদা-বৌদির কাছে—যাঁরা তাঁর বিয়ের পর তাঁর মুখদর্শন করেননি, আর ফিরে যাচ্ছেন পুষ্পিকার কাছে—যে এখনও তাঁকে ক্ষমা করে গ্রহণ করতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট রঞ্জিতা ইচ্ছা করলে তাঁর আর পুষ্পিকার মিলনে শুধু যে বাধা দিতে পারেন তা নয়, তিনি তাঁদের চরমতম সর্বনাশও করতে পারেন। তাই রঞ্জিতার কাছে তাঁর একান্ত অনুরোধ, বিনীত প্রার্থনা, সকরুণ ভিক্ষা যে তিনি যেন তাঁকে মুক্তি দেন, শুধু মুক্তি।

সম্বোধনে রঞ্জিতার নাম দিয়ে যেমন তিনি চিঠি সুরু করেছেন, শেষ করেছেন তেমনি নিজের নাম দিয়ে, সম্পর্কটা তাঁদের যেন স্বামী-স্ত্রীর নয়—রঞ্জিতা যেন তাঁর 'থার্ড পার্সন।'

রঞ্জিতার মনে হল গোটা পৃথিবীটা যেন তাঁর পায়ের তলা থেকে বহু দূর নীচে তলিয়ে গেছে, আর তিনি যেন অবলম্বনহীন শূন্য মার্গে উৎক্ষিপ্ত দ্বিতীয় ত্রিশঙ্কু।

বিমূঢ় ভাবটা কেটে যেতে পর্দা ঠেলে ভিতরে শয়ন কক্ষে ঢুকে দেখলেন স্বামীর পালঙ্ক শূন্য। কিছুকাল-যাবৎ কক্ষটির দু-প্রান্তের দুটি পালঙ্কে পৃথক শয্যায় তাঁরা পৃথক শয়ন করতেন। আর দেখলেন স্বামীর শুধু সেই হ্যাণ্ড সুটকেশটি নেই।

ঘাসকুসুমায় যাওয়ার জন্য কারটি প্রস্তুত ছিল। মুহূর্তে কক্ষ থেকে বেরিয়ে সোফারকে না-ডেকে নিজেই তাতে ষ্টার্ট দিলেন। গেটের কাছে রঞ্জিতদের দেখা পেয়ে বললেন, 'আপনারা একটু এগিয়ে যান। আমি ষ্টেশন হয়ে যাচ্ছি।'

ষ্টেশনে পৌছে দেখলেন ট্রেনটি সবেমাত্র প্ল্যাটফরম্ ছেড়ে মেন লাইনে বাঁক নিয়েছে। তখুনি ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে ঢুকে ষ্টেশন মাষ্টারকে হুকুম করলেন, 'প্লিজ ষ্টপ দি ট্রেণ য্যাণ্ড ব্যাক টু দি প্ল্যাটফরম্।'

এভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমনে ষ্টেশন মাষ্টারের অবস্থা মরি-কি-বাঁচি। তিনি রিংটা মুখে ধরে সিগন্যাল-ম্যানকে যথা নির্দেশ দিলেন। আর অন্য একজনকে ফাষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম খোলার চাবিটি দিলেন।

ট্রেন-প্রত্যাবর্তনের কারণ জানতে ট্রেনের দরজা-জানালায় ভিড় জমে গেল। কিন্তু থার্ড ক্লাশ কামরার এক জানালায় গালে হাত দিয়ে অপূর্ব সেই যে বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন। সমগ্র অতীত তাঁর মনের দরজায় অর্গল দিয়ে দিয়েছে।

বিস্ময়ের ভান করে রঞ্জিতা বললেন, 'তুমি এখানে বসে আছ, নেমে এসো।'

রঞ্জিতার কণ্ঠস্বরে অপূর্ব বর্তমানে ফিরে এলেন। তিনি সাড়া দিলেন, 'না।'

আবার সেই বিস্ময়ের ভান করলেন রঞ্জিতা, 'টিকিট তো দুখানাই ফার্ষ্ট ক্লাসের—'

কিন্তু যাত্রীদের কৌতূহলী দৃষ্টির সরলরেখাগুলি যে কেন্দ্রে এক বিন্দুতে মিলেছে তা উপলব্ধি করে মর্মে মরে যেতে লাগলেন রঞ্জিতা। কতকটা সে-দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করার জন্য কতকটা স্বামীকে নামিয়ে আনার জন্য গাড়ীতে উঠবার হাতল ধরলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্যুটকেশ হাতে অপূর্ব দরজার কাছে এগিয়ে এলেন।

ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় তাঁরা উঠতেই বিনয়ে নুয়ে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন, 'স্যার…', কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভুলটা ধরতে পেরে প্রায় আঁৎকে হাত কচলিয়ে আরও নুয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ম্যাডাম, এবার ট্রেন ছেড়ে দেব ?'

'নো, ওয়েট ফর ফিফটিন মিনিটস্।' আদেশ করলেন রঞ্জিতা। 'ইয়েস ম্যাডাম,' প্রায় নব্বই ডিগ্রী নুয়ে স্যালিউট মাফিক নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন ষ্টেশন মাষ্টার।

দরজা বন্ধ করে হতভম্ব স্বামীর পকেট থেকে কাগজ কলম নিয়ে খস্‌খস্ করে লিখে কাগজটি স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন, 'আজকের ডাকে এটা পাঠিয়ে দেব।'

অপূর্ব পড়তে আরম্ভ করলেন লেখাটা, 'টু দি চিফ্ সেক্রেটারী, গভর্ণমেণ্ট অব্…। সাবজেক্ট : রেজিগনেশন অব্ মিসেস রঞ্জিতা রায়, আই, এ, এস, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট য়্যাণ্ড কালেক্টার…।

আর না পড়ে বিমুগ্ধ নিস্পলক নেত্রে অপূর্ব তাকালেন রঞ্জিতার শান্ত সমাহিত মুখের দিকে এবং সে-মুখে পড়তে চেষ্টা করলেন স্ত্রীর অন্তরের অতলান্ত রহস্য। নির্বাক অপূর্ব স্ত্রীর ডান হাতটি কোলে টেনে শুধু আলতোভাবে নিপীড়ন করতে লাগলেন। বহুদিন পরে বধূকে ফিরে পাওয়ায় স্থান-কাল ভুলে গেলেন তিনি। বধূকে নিবিড় পেতে তাঁর

কটি-বেষ্টনের উদ্দেশ্যে যখন হাত বাড়ালেন তিনি, তখন তাঁরা বাইরে শুনতে পেলেন ষ্টেশন মাষ্টারের গলা, 'ম্যাডাম, ফিফ্‌টিন মিনিটস্‌ পাসড্‌।'

স্বামীর হাত থেকে হাত টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রঞ্জিতা বললেন, 'ইয়েস্‌, গেটিং ডাউন।' এবং স্বামীর দিকে ঘুরে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ওঠো, ট্রেন ছেড়ে দেবে।' তারপর অধরোষ্ঠে মৃদু হেসে অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ হেনে কৌতুকে মধু-কণ্ঠে বললেন, 'আর একটা মাস কী লেডি-ম্যাজিষ্ট্রেটের কনসর্ট হয়ে থাকতে পারবে না'।

তারপর বাইরে এসে 'কারে' উঠতে গিয়ে রঞ্জিতা জানালেন ঘাস কুসুমার ঘটনাটি। শেষে বললেন, 'চল না একটু বেড়িয়ে আসবে। তোমাকে নিয়ে বহুদিন ড্রাইভ করার সময় তো আমার হয় নি।'

কিন্তু কারে বসতে গিয়ে অকস্মাৎ তাঁর অন্তর পেট মোচড় খেয়ে উঠল ; এক অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কঁকিয়ে উঠলেন। সে কাতর যন্ত্রণার গভীর বেদনা তাঁর গোটা মুখে ফুটে উঠল। কাৎরিয়ে অস্ফুটে তিনি স্বামীকে শুধু বললেন, 'আমাকে ধর।'

মুহূর্তে ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন অপূর্ব। ত্বরিতে স্ত্রীকে সিটে এলিয়ে বসিয়ে দিলেন। তারপর এক হাতে তাঁকে ভালো করে ধরে অন্য হাতে গিয়ার টানলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টিয়ারিং ঘুরালেন,—কিন্তু ঘাসকুসুমার দিকে নয়, সিভিল সার্জনের কোয়ার্টারের দিকে।

স্বামীর গায়ে ভর দিয়ে পেট চেপে চোখ বুজে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়ে রইলেন রঞ্জিতা। অদ্ভুত অথচ মধুর এক অনুভূতিতে তিনি সম্মোহিতা। গর্ভে তাঁর স্বামীর প্রথম সন্তান যে নড়ে উঠেছে।

বৈশাখ, ১৩৬১

দিগন্তিকা

: এক :

'চমৎকার অভিনয়!' বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে তাকাল তার দিকে।

'হ্যাঁ, আপনি চমৎকার অভিনয় করতে পারেন।'

'যাঃ!' তার বিস্ময়-বিস্ফারিত আঁখিতে বয়ে গেল ব্রীড়ার ক্ষনিক তরঙ্গ।

'সত্যিই, আপনার কণ্ঠটি যেমনি সুন্দর, কথাবলার ভঙ্গিটি তেমনি আকর্ষণীয়। আপনার 'মুভমেণ্টস্' নিপুণ অভিনেত্রীর মতো।'

'তবে আর কী, আমাকে আপনার নূতন ছবিটার 'হিরোইন' করে ফেলুন,' কৌতুক-স্বরে হেসে উঠল সে।

'ঠাট্টা করবেন না, আপনি যদি রাজী হন তো বর্তে যাই। হিরোইনের জন্য অনেক চেষ্টা করছি, ঠিক মতন কাউকে পাচ্ছি না। আপনার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। নামবেন সিনেমায়?'

'য্যা!' এবার সত্যিই লজ্জার আভাষ পাওয়া গেল তার কণ্ঠে।

'যা কেন? অভিনয় যখন বেশ করতে পারেন, তখন নেমে পড়ুন। দেখছেন তো, আজকাল ভদ্র-ঘরের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েরাও হামেশা নামছে। এ লাইনে নাম কত। একটু খ্যাতি ছড়িয়ে গেলে অর্থও তেমনি। নেমে পড়ুন।'

'আচ্ছা, সে হবে এখন।' গেটের সামনে কারটা দাঁড়াতেই সে শুধু একা কার থেকে নেমে পড়ল।

'না দেরী করা চলবে না, ভেবে-চিন্তে শীঘ্র মত দেবেন। পরশুদিন আসছি। এখন চলি, গুড্ বাই।'

ঃ দুই ঃ

ডাইরেক্টার লাহিড়ীর কারটা চলে যেতেই অতসী গৃহ-প্রাঙ্গণে ঢুকলো। যে চাকরটি গেট খুলে দিতে এসেছিল প্রাঙ্গণ-পথে ঘর-মুখো চলতে চলতে তার কাছ থেকে সে জেনে নিল, স্বামী তার ঘণ্টা দুই আগে অফিস থেকে এসে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেবে সে আশ্চর্য হল, অদ্ভুত লোক তার স্বামী। দিনরাত শুধু কাজ আর অফিস, অফিস আর কাজ। রিক্রিয়েশনের একটুও প্রয়োজন-বোধ করে না। তা নাহলে এত করে বলা সত্বেও আজকের এমন অনুষ্ঠানটায় গেল না কেন?

আপন কক্ষে ঢুকে পোষাক বদলিয়ে স্নানাগারে গেল সে। অভিনয়ের মেক-আপী রংকে সাবান দিয়ে ঘষে-মেজে তুলে ভাল করে স্নান করে স্নিগ্ধ হল। তারপর খেয়ে-দেয়ে শয়ন-কক্ষে গিয়ে দেখল, স্বামী তার গভীর নিদ্রার অচেতন। তাকে আর না জাগিয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সে নিজের পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, তার সম্বন্ধে ডাইরেক্টার লাহিড়ীর কথাগুলি; 'আপনি চমৎকার অভিনয় করতে পারেন,··সিনেমায় নেমে পড়ুন...নাম হবে...।' বিশেষ করে 'নাম হবে' কথাটি তাকে ভয়ঙ্কর ভাবিয়ে তুলল। এবং সিনেমায় নামবে কী না এবং নামা উচিত কী না—এই কথা ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিবশতঃ সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঃ তিন ঃ

সে বছর চারেক আগের ঘটনা। বোম্বের সমুদ্র-সৈকতের এক নির্জন অংশে দাঁড়িয়ে এক অপরাহ্ন-বেলায় আরব-সাগরের নীল-বুকে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্যের নয়ন-বিমোহন দৃশ্য যখন তন্ময় হয়ে দেখছিল অতসী, তখন সে সেখানে আচম্বিতে আবিষ্কার করল তরুণ সিভিলিয়ান অমিয়ভূষণ সেনকে। অতসী যেমন আবিষ্কার করল সিভিলিয়ান অমিয়-ভূষণ সেনকে; অমিয়ভূষণও তেমনি আবিষ্কার করল শান্তিনিকেতনের সন্ত-

প্রাক্তন ছাত্রী অতসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাদের এই অকস্মাৎ আবিষ্কার রূপান্তরিত হল ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে; ঘনিষ্ঠ পরিচয় পরিবর্তিত হল গভীর প্রেমে। তারপর এই হঠাৎ আবিষ্কারের শেষ অঙ্কে তারা পরস্পর পরস্পরের হল প্রিয় আর প্রিয়া। অতসীর ব্রাহ্মণ-পিতা তাদের এই বিয়েতে মত না-দিলেও অতসী স্বেচ্ছায় শেষ পর্যন্ত অমিয়কেই বিয়ে করল এবং তা সম্পন্ন করল বিশুদ্ধ হিন্দুমতে সংস্কৃত শাস্ত্রের মন্ত্রপাঠ করে। তারপর তারা নীড় বাঁধলো সাদার্ণ এভিনিউর এক প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে।

কর্মে যেমন অমিয়ভূষণ সেনের—অর্থাৎ মিঃ এ, বি, সেনের, সংক্ষেপে মিঃ সেনের গভীর নিষ্ঠা, বুদ্ধির কূট-কৌশলে সে তেমনি তীক্ষ্ণ। তাই কয়েক বছরের মধ্যেই পদোন্নতির ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে আজ সে সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারীর পদে উন্নীত। সকাল ন'টায় সে অফিসে পৌছে, সন্ধ্যা সাতটায় অফিস ত্যাগ করে। এদিকে সে যখন সমাজ-সংসার ভুলে গিয়ে শুধু ফাইলের মধ্যে একান্ত গভীরভাবে ডুবে থাকে, তখন গৃহে তার সহধর্মিনী তার ফাঁকা সময়টাকে হাই তুলে, তুড়ি ভেঙ্গে উপন্যাসের পাতা উল্টিয়ে কাটায়! ফলে অবশেষে একদিন নিঃসন্তান অতসী তার কর্মহীন অলস জীবনের ফাঁকা-সময়টাকে ভরিয়ে তুলবার জন্য পাড়ায় স্থাপন করল 'মহুয়া' ক্লাব এবং নিজে হল তার সম্পাদিকা। বিলেতি-সংস্করণ হাল-ফ্যাসানী সমাজের নর-নারীরা হল তার সভ্য। ক্লাব-আইনের নিয়মে নির্দিষ্ট হল তার সভ্য-সংখ্যা। ক্লাবের কর্মসূচীর প্রধান অংশ নিয়মিত তাস, পিংপং প্রভৃতি 'ইন-ডোর' খেলা; অবশ্য মাঝে মাঝে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ঘটে এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে নাটকও অভিনীত হয়।

এমনি এক সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে এই ক্লাবের সভ্য তার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে এখানে আসে খ্যাতনামা সিনেমা ডাইরেক্টার পূর্ণেন্দু লাহিড়ী। বন্ধুটি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ক্লাব-সম্পাদিকা অতসী সেনের

সঙ্গে। স্মিত হেসে অতসী এক সময় বলল, 'আপনারা ডাইরেক্টর মানুষ, সময় আপনাদের কম; তবুও সময় করে যদি মাঝে মাঝে দয়া করে বেড়াতে আসেন আমাদের ক্ষুদ্র ক্লাবে, তাহলে কৃতার্থ হবে আমাদের ক্লাব।'

ফলে ডাইরেক্টার লাহিড়ী হলেন ক্লাবের সভ্য এবং অংশও নিতে লাগলেন ক্লাবের আনন্দ-কোলাহলে!

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ক্লাবে অভিনীত হল 'চিত্রাঙ্গদা'। এবং চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় নামল অতসী নিজে। অতসীর অভিনয় দেখে ডাইরেক্টার লাহিড়ী হলেন মুগ্ধ। তিনি তার নির্মীয়মান ছবি 'কালান্তরের' নায়িকার জন্য নূতন অভিনেত্রীর সন্ধানে রত ছিলেন। হঠাৎ এখন অতসীকে সে-নায়িকার যোগ্য অভিনেত্রীরূপে তার মনে ধরে গেল। তারপর অভিনয় শেষে অন্যান্য অনেক বারের মতো অতসীকে নিজের কারে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পথে তাকে জানাল আপন অভিপ্রায়।

ঃ চার ঃ

সিনেমায় নামবে কী নামবে না—এই নিয়ে কয়েকদিন ধরে অতসী অনেক ভাবল। সকাল-বিকাল বাড়ীতে বসে বসে, দুপুরে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে, সন্ধ্যায় বাইরে বেড়াতে বেড়াতে কথাটা নিয়ে সে অনেক চিন্তা করল। অবশেষে সে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল, সে সিনেমায় নামবে।

ইতিমধ্যে মিঃ লাহিড়ীর বার বার অনুরোধ—সিনেমায় নামার মধ্যে বিপুল খ্যাতি ও অর্থের লোভ, তার মনকে সিনেমায় নামায় অনুকূল করে তুলল। তাই সে ভাবল, জীবনে যখন নতুন পথের ডাক এসেছে সে-ডাকে সে সাড়া দেবে, সে পথের সন্ধানে সে নেমে পড়বে। শুধু স্ফূর্তি করে জীবন না-কাটিয়ে পৃথিবীর পাঁচ জনকে যদি সামান্য

আনন্দ দিয়ে যেতে পারে, সেই হবে তার জীবনের চরম পাওয়া। পৃথিবীর এই এক ক্ষুদ্র কোনে কর্মহীন, খ্যাতিহীন জীবন সে আর কাটাতে চায় না—পৃথিবীর পাঁচজন লোক তাকে জানুক।

সুতরাং সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্রম্ভালাপকালে অতসী স্বামীকে জানাল নিজের সংকল্পের কথা।

'বলো কী!' বেশ একটু বিস্মিত হল মিঃ সেন।

'কেন? এটা তো একটা আর্ট।'

'অভিনয় যে একটা আর্ট, তা বুঝি। তবে আমার আপত্তিটা তোমার সিনেমায় অভিনয়ের পক্ষে।'

'আপত্তিটা কেন?'

'আমার প্রেস্‌টিজে আঘাত লাগবে।'

'তোমার প্রেস্‌টিজে আঘাত লাগবে!' একটু আশ্চর্য ভাব দেখিয়ে হেসে উঠল অতসী। 'না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! শুধু ফাইলের মধ্যে তো ডুবে থাকো; পৃথিবীর কোথায় কী-ঘটেছে, কোথায় কী হচ্ছে, তার তো কোনো খবরই রাখো না, দেখতে পাওনা। আজ-কাল তোমার চেয়ে অনেক উঁচু প্রেস্‌টিজওয়ালার বউরা সিনেমায় অভিনয় করছে!'

'তা করুক। আমি তোমার সিনেমায় নামা পছন্দ করি না। ক্লাবে যেমন জলসা-অভিনয় করছ, তেমনি কর না। কেন মিছিমিছি আবার ঝামেলার মধ্যে যেতে চাও।'

'এর মধ্যে আবার ঝামেলা কী' একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে অতসী আবার বলা সুরু করল, 'দেখ, অভিনয় আমি বহুবার করেছি। শান্তি-নিকেতনে ওটা একরকম আমার পেশা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে দেশী-বিদেশী বহু নামকরা লোকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি। যাক্ সেকথা। সেদিন চিত্রাঙ্গদার অভিনয় দেখে ডাইরেক্টর লাহিড়ী আমাকে

ধরেছেন তাঁর নতুন ছবিটায় নামবার জন্তে। কাল এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসবেন।' তারপর তার মধুবর্ষী কণ্ঠে সোহাগ মিশিয়ে বলল, 'লক্ষ্মিটি, বাধা দিও না। একটিবার দেখিনা পর্দায় কেমন অভিনয় করতে পারি।'

'বেশ তাই হবে।' নির্লিপ্তভাবে সম্মতি জানাল মিঃ সেন।

সুতরাং সিনেমাকাশে আবির্ভূত হল অতসী; তবে 'উজ্জয়িনী দেবী'রূপে। তারপর মাসকয়েক পরে 'কালান্তরে'র নায়িকারূপে ভেসে উঠল সিনেমার পর্দায়।

ঃ পাঁচ ঃ

'কালান্তর' অতসীর জীবনে আনল যুগান্তর।

তার অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসায় বাংলা দেশের পত্রিকাগুলি মুখরিত হয়ে উঠল। সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রিকাসমূহে নানা অঙ্গ-ভঙ্গির ছবিসহ তার অলৌকিক জীবনী প্রকাশিত হল। এক ছবিতে অভিনয় করেই সে বাঙালি তারকাগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা বলে বিবেচিত হল। রাতারাতি সে বাঙলা-সিনেমাকাশের মধ্যগগনে উজ্জ্বল তারকারূপে দেদীপ্যমান হয়ে উঠল।

ফলে বহু ছবিতে অভিনয় করার জন্ম তার কাছে অনুরোধ আসতে লাগল .এবং সেও যথারীতি সেগুলিতে চুক্তিবদ্ধ হতে লাগল। অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি—এই ত্রয়ী এক হয়ে তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল।

যেন কোনো যাদু-কাঠির স্পর্শে অতসীর জীবন-পথ অকস্মাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরে গেল। তার চল্‌তি জীবনের সরুখাতে যে-স্রোত ধীরে বইছিল, সেখানে সহসা বহিঃসমুদ্রের প্রবল বান ডেকে এলো। আর সে বানের খরস্রোতে সে ভুলে গেল তার সমাজ-সংসার, ভুলে গেল তার স্বামীকে।

স্বামীর জীবন যদি একান্তই কর্মের হয়ে উঠে এবং স্ত্রীর জীবন যদি উদ্দাম মুক্ত স্ফূর্তির বিলাসী খাতে বইতে থাকে, সেখানে তাদের দাম্পত্য-জীবন গভীর নিরানন্দময় চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় : অমিয়-অতসীর দাম্পত্য-জীবনও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। অভিনেত্রীর স্বামী যদি অভিনেতা ছাড়া উকিল, ডাক্তার, হাকিম কিংবা অন্য কোনো পদস্থ ব্যক্তি হন, তাহলে ঐ স্বামীর অন্তরে অশান্তির আগুন যেমন জ্বলতে থাকে, তেমনি তার অস্তিত্ব তার ঐ স্ত্রীর জীবনে শুধু সংস্কৃত লুপ্ত'হ' ছাড়া আর কিছুই নয়।

অমিয় নিতান্তই কর্মের মজুর হলেও, সে-ও ষড়-রিপুর অধীন একটি মানুষ, তারও বুকের পাঁজরের মধ্যে হৃদয় আছে। তাই যখন আজকাল অফিস যাওয়ার আগে প্রিয়ার হাসি-মুখ দেখতে পায় না, অফিস-ক্লান্ত হয়ে এসে প্রিয়ার সোহাগ-ভরা মধুস্বর শুনতে পায় না ; তখন কখনও কখনও অন্তরে সে একটা আগুনের জ্বালা অনুভব করে, যে আগুন পুড়ে মরে না, শুধু তিলে তিলে দগ্ধে মারে। অথচ সে-ব্যথা, সে জ্বালা সে বাইরে প্রকাশ করে না।

অতসীকে দোষ দেওয়া চলে না। একই সময়ে বহু ছবিতে অভিনয় করার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেও যেন বিশ্রাম পাচ্ছে না। দুপুরেই তাকে ষ্টুডিওতে চলে যেতে হয়। তারপর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ষ্টুডিওতে সুটিং সেরে গভীর রাত্রিতে তাকে গৃহে ফিরতে হয়। ফলে, নিবিড় ক্লান্তির জন্য ঘুম থেকে উঠতে তার নটা-দশটা বেলা হয়ে যায়।

অতএব······

অতএব তবুও কোনো কর্মহীন অলস অপরাহ্ণবেলায় অতসী যখন আপন অতীত জীবনের কথা ভাবে, তখন তার এই সেদিনের মধুর দাম্পত্য-জীবনের কথা মনে পড়ে যায় এবং মনে মনে সেদিনের সঙ্গে বর্তমানের দাম্পত্য-জীবনের তুলনা করে লজ্জায় শিউরে উঠে। তারপর

স্বামীর প্রতি অবহেলার জন্যে নিজেকে হঠাৎ অপরাধিনী ভাবে এবং তৎক্ষণাৎ চাকর-চাকরাণীদের ডাক দেয়। তারপর তন্ন তন্ন করে সংসার যাত্রার হিসাব নেয় আর খোঁজ নেয় স্বামীর প্রতি তাদের ব্যবহার-যত্নের। ক্ষণিকের জন্য সে আবার আগের মত স্বামীর চঞ্চলা প্রেয়সি হয়ে উঠে, তেমনি সোহাগ করে, যত্ন নেয়, তেমনি করে কোলে মাথা রেখে নিজের মধুক্ষরা কণ্ঠের গান শোনায়, এমনকি তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের নামা কোনো সিনেমা দেখতে চলে যায়।

ক্ষণিকের জন্য সে আবার স্বামীর সঙ্গে পূর্বের মতো এক প্রাণ, এক আত্মা হতে চায়; কিন্তু পারে না। কোথায় যেন একটা দুস্তর ব্যবধান রয়েছে—যেন পাথর-সিমেন্টের জমাট বাঁধানো বিরাট দেওয়াল তাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অতসী ভাবে, তার সিভিলিয়ান স্বামীর প্রাণ নেই—সে যেন কর্মের একটি বস্তু-পিণ্ড। অমিয় ভাবে, তার অভিনেত্রী স্ত্রীর এটি আর এক রকমের কোনো নূতন অভিনয়।

তবুও এমনিভাবে তাদের দাম্পত্য-জীবনের আরও একটি বছর কেটে গেল।

: ছয় :

অতসী এখন বাঙলা-সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। গত বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী-নির্বাচনে সেই সর্বাধিক পয়েণ্টেস পেয়েছে। বর্তমানে সে বাংলা সিনেমা ছেড়ে হিন্দী-সিনেমায় নামতে চায়। তাই বোম্বের কয়েকটি ফিল্ম-প্রডিউসারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তারপর একদিন রবিবার বিকেলে বোম্বে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

অমিয় একটি ইজি-চেয়ারে শুয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার রবিবারের ম্যাগাজিন অংশটা পড়ছিল। অতসীর হৈ চৈ করে হোল্ড-অল

বিছানা-পত্র, চামড়ার একটা বড় স্যুটকেশে পোষাক পরিচ্ছদ গোছানোয় সে বুঝল, অতসী কোনো দূরাঞ্চলে ভ্রমণে যাচ্ছে। কিন্তু সে যেন কিছুই দেখছে না, শুনছে না—এমনি নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়ে যেতে লাগল।

'দেখ, দিন কয়েকের জন্য বোম্বে যাচ্ছি।' কথাটা তাকে বলতে বলতে অতসী তার সামনের কোচটায় বসে পড়ল।

অমিয় কাগজ থেকে চোখ তুলে তা স্থাপন করল স্ত্রীর চোখে। তারপর নির্লিপ্তভাবে বোম্বে যাবার কারণ শুধাল।

অতসী তার যাবার কারণ বুঝিয়ে বলল।

'বাংলায় বুঝি আর পোষালো না।' অমিয়র কণ্ঠস্বরে কিছু খোঁচা প্রকাশ পেল।

'মানে—'

'মানে আমার চেয়ে তুমি ভালো বোঝো।' অমিয় খবরের কাগজে চোখ নামাল।

দাম্পত্য-জীবনে যদিও আজ তারা কেউই সুখী নয়, তবুও যাবার সময় কোনো অবাঞ্ছিত কলহ যাতে না হয়, সেইজন্যে তার অভিনয়ী বুদ্ধি দিয়ে অতসী স্বামীকে ঠাণ্ডা রাখতে চাইল, 'লক্ষ্মিটি, যাবার সময় আর কথা কাটাকাটি করো না। প্রসন্নমনে যেতে দাও, জানো তো বাঙলা ফিল্মে টাকাও নেই, নামও নেই; হিন্দী ফিল্মে টাকাও যেমন, তেমনি একটা সর্বভারতীয় খ্যাতি রয়েছে।' তারপর বাম হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর দেরী করা যাবে না, ছ'টায় প্লেন ছাড়বে। এখন চলি।' বলে সে উঠে দাঁড়াল।

'না, তুমি যেতে পাবে না।' গম্ভীরভাবে বলল অমিয়।

'যেতে পাবোনা।' বিস্মিত অতসী ঘুরে দাঁড়াল।

'না।' অমিয়র কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই গম্ভীর।

'মানে !'

'মানে কিছুই নয়। আমি নিষেধ করছি, এই যথেষ্ট।' এই সর্ব প্রথম তার সিভিলিয়ান মেজাজ আত্মপ্রকাশ করল স্ত্রীর কাছে।

তার স্ত্রীও জবাব দিল তেমনি, 'এটা সরকারী দপ্তরখানা নয়, আমি তোমার অধঃস্তন কেরানি নই।'

'তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মেনে চলবে,—এইটাই নিয়ম।'

'এ নিয়মটা যদি না মানি।'

স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী ঝানু সিভিলিয়ান মিঃ এ, বি, সেন গৃহিনীর এই কথাটার আর জবাব দিতে পারল না, শুধু বোবা হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় বাইরে হর্ণ বেজে উঠল।

দুজনেই জানালা দিয়ে সেদিকে তাকাল, দেখল ডাইরেক্টর লাহিড়ী গাড়ীর দরজা খুলে নামছে।

'উনি এসে গেছেন, আমি চলি।' অতসী বাইরের দিকে পা বাড়াল।

'শোনো'—

অতসী ফিরে দাঁড়াল।

'ডাইরেক্টার লাহিড়ীও বুঝি যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, উনি ওখানে কয়েকটা কাজ পেয়েছেন।'

'এতোক্ষণে বুঝলাম'—হঠাৎ কোনো একটা গোপন তথ্য আবিষ্কারের সূত্র সে যেন পেয়ে গেল।

'কী বুঝলে,'—অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করল অতসী।

'তোমার বম্বে যাওয়ার অর্থ।'

'মানে !'

'মানে, ঐ মৃতদার ডাইরেক্টারটি যে ছবিতে ডিরেকশান দিবেন, সে

ছবিতে তোমার নায়িকা হওয়া চাই ; উনি যেখানে যাবেন, সমাজ-সংসার ছেড়ে তোমার সেখানে যাওয়া চাই।'

'এমনি অভদ্র ইঙ্গিত করার অর্থ—'

'সত্য কথা প্রকাশ করলেই তা অভদ্র ইঙ্গিত হয় না।'

'তোমার সঙ্গে ইতরামো করার সময় আমার নেই।' বলেই অতসী আবার পা বাড়াল।

'আর একটা কথা শুনে যাও।'

অতসী আবার একটু দাঁড়াল।

'আমার কথা যদি না শোনো, মনে থাকে যেন এ-বাড়ীর দরজা তোমার কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।' এই সর্বপ্রথম অমিয় তার স্বামীত্ব জাহির করল স্ত্রীর কাছে।

তার অভিনেত্রী আধুনিকা স্ত্রী তেমনি জবাব দিল তার মুখের উপর, 'রাষ্ট্রের এক ঝানু সিভিলিয়ানের মুখে এমন বালখিল্য কথা শোভা পায় না। ভূ-ভারতে বুঝি এইটাই একমাত্র গৃহ!' বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। নেমে দেখল চাকর দুটি তার বেডিং ও সুটকেশ নিয়ে বাইরে হতচকিত কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরকে সেগুলো আনতে নির্দেশ দিয়ে অতসী দ্রুতপদে মিঃ লাহিড়ীর কাছে চলে এলো। ওদের স্বামী স্ত্রীর বাক্-যুদ্ধের কিছু আওয়াজ শুনতে পেয়ে লাহিড়ী ভেতরে অগ্রসর হওয়ার আর সাহস পায়নি।

এদিকে অমিয় যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এ কী! তার স্ত্রী তাকে এমন তুচ্ছ ভেবে অপমান করে গৃহত্যাগ করল! সহসা এতদিন পরে সে যেন তার নিজের ভুলটা আজ ধরে ফেল্‌ল,—রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রপথে তার যে দৃষ্টিটি ছিল সজাগ, কিন্তু তা ছিল না শুধু নিজের ছোট গৃহটির দিকে। জীবনের ব্যর্থতার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

তার বেরিয়ে গেল, আর তার মনে হল, তার দেহের শিরা-উপশিরাগুলি সব যেন ছিঁড়ে গেছে, তার দেহের মাংসপেশীগুলি যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে ; সে আর দাঁড়াতে পারছে না। টপ করে জানালার দুটো গরাদে ধরে ফেলল। আর বাইরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, ডাইরেক্টার লাহিড়ী অতসীকে পাশে বসিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

: সাত :

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়েই ডাইরেক্টার লাহিড়ী অতসীকে জিজ্ঞেস করল, 'মিঃ সেন মনে হল অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ব্যাপার কী ?' ভ্রু কুঁচকে বলতে বলতে কৌটা থেকে দুটো সিগারেট বের করলেন মিঃ লাহিড়ী।

'ওর সঙ্গে আজ সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলাম।' নির্বিকার চিত্তে বলে গেল অতসী।

'বাঁচা গেল,' বলে মিঃ লাহিড়ী একটা সিগারেট নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলেন এবং অপরটি অতসীর লিপষ্টিক-রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে ধরিয়ে দিলেন।

তারপর...

তারপর মৃতদার ডাইরেক্টর লাহিড়ী যেন বাঁচারই আনন্দে গাড়ীর গতি অনেক বাড়িয়ে দিলেন। গাড়ীটা নূতন শক্তি পেয়ে যেন উল্কার বেগে উড়ে চলল।

ভাদ্র ১৩৬০

মিস্ ইরাবতী সেন

নাচের মুদ্রার মতো আঙ্গুল করে প্যাগোডা-ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সাহানা-দি বের করলেন রুমাল আর আয়না। রুমালটা আলতো ভাবে বুলিয়ে নিলেন চোখে-মুখে-কপালে। আয়নাটা তুলে দেখে নিলেন মুখের নকল রূপ আর মাথার পার্শি কেশ-বিন্যাস। তারপর সে দুটাকে ব্যাগে ভরে সদ্য-আগত পাশের মেয়েটিকে হাসি-মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, কাল রাত্রি কাটল ক্যামন ?'

মেয়েটি ওষ্ঠ-উপান্তে লজ্জা-হাসি টেনে বলল, 'কেমন আর, পাঁচজনের কাটে যেমন।'

'হুঁ, তাই বললেই হলো আর কী! ফুলশয্যার গন্ধ এখনও গা থেকে যায়নি!' সাহানা-দির ওষ্ঠে কৌতুকমিশ্রিত ঠাট্টার সুর।

'ধেৎ, ওরা যে শুনতে পাবে।' নেলির কণ্ঠে লজ্জার সুর।

'শুনলেই বা, তুই চোর নাকী! চুরি করেছিস্ ?' সাহানা-দির গলার স্বর বেড়ে গেল আর এক ঘাট।

'তাই বলে ঢাক পেটাতে হবে না কী—বিশেষ করে পুরুষদের কাছে।'

'পুরুষরা বুঝি কিচ্ছু বোঝেনা। ওরা তো আরো বেশী হ্যাংলা,...এই যে অমিতবাবু, কেমন আছেন। এ্যাঁ! চোখ-মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে! রাত্রে বুঝি ঘুম হয়নি ?' নেলির স্বামীকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে সাহানা-দি নেলিকে ছেড়ে তাকেই ধরে বসলেন।

অমিত থমকে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে ওষ্ঠে চাপা-হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন।' বলেই চলতে সুরু করল।

'ধেৎ, অসভ্য,' কোপন-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে তাকাল নেলি। এই মধুর দাম্পত্য-আলাপ-দ্বন্দ্বের পুরো রসটি উপভোগ করলেন সাহানা-দি। তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

সাহানা-দির হাসি দেখে স্বামীর উপর চটে উঠল নেলি। ভাবল একটু যদি লজ্জা-সরম আছে। কিন্তু স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেবার উপায় এখানে না-থাকায় পক্ষান্তরে সাহানা-দির হাসি থামাবার চেষ্টা করল, 'আচ্ছা সাহানা-দি, পুরুষ-মানুষ এমন অসভ্য হয় কেন বলতে পারো?'

'ওরা কবে আবার সভ্য ছিল। আমরাই তো ওদের যা-হয় একটু সভ্য করে তুলেছি। কেন? কী হয়েছে?'

'না, এমন কিছু নয়। সারা রাত্রিটা যদি ঘুমুতে দেয়, বলে গল্প করো।' মুখে আবার তার সেই লজ্জার রেখা।

কিন্তু সাহানা-দির হাসি থামাতে গিয়ে তার রসালোচনার খোরাক জুগিয়ে দিল নেলি। সাহানা-দি জোরেই বলে উঠলেন, 'সে তো তোর ভাগ্য রে, সারারাত গল্প করবি, প্রেমের গল্প'—

'প্রেমের গল্প! অফিসে কার প্রেম এতো উথলে উঠল।' বলতে বলতে সাহানা-দির পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লো চিত্রা।

আরো রস-ফলিয়ে সাহানা-দি বিবৃত করলেন এই রসাল ব্যাপারটা।

'হুঁ, ঘুমতে দেয় না। দু'একটা ছেলেপুলে হোক, দেখবি, তখন শত ডাকাডাকিতেও আর ঘুম ভাঙবে না—একেবারে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।' নেলির দিকে চেয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলল চিত্রা।

'ও-টা তোমার বাড়াবাড়ি হল।' জবাব দিলেন সাহানা-দি।

'বাড়াবাড়ি! তুমি তো বুঝবে না সাহানা-দি। তোমরা বেশ সুখে আছ, ছেলে-পুলে হয়নি, কোনো ঝামেলা নেই। অন্ততঃ রাত্রিটা সুখে ঘুমুতো পারো।...এ ছেলের দুধ গরম রে, ও-ছেলের পায়খানা যাওয়া রে, এর ট্যাঁ, ওর এ্যাঁ। রাত্রে কী একটু ঘুমুবার যো আছে। আর

ওকে যদি গড়িয়ে এক মাইল নিয়ে যাও, তবুও ওর ঘুম ভাঙবে না, কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে। বুঝবি পরে নেলি—দিল্লীকা লাড্ডু কী জিনিষ।' বলে তিন ছেলের জননী চিত্রা ভ্রূকুটি করে টেবিলের ড্রয়ার টেনে তাতে তার মার্কেটিং ব্যাগটা পুরে দিল।

নিঃসন্তান সাহানা-দি গুম্ হয়ে গেলেন। চিত্রার আঘাতে তাঁর গোপন ব্যথাটি টনটন করে উঠল। এরপর নেলিও আর মুখ ফুটে কিছু বলল না। ফলে এই রসালো আলোচনায় এইখানে পড়ল ছেদ।

কাজেই তারা প্রত্যেকে টেবিলে-রক্ষিত এক একটা ফাইল টেনে খুলতে লাগলো।

সরকারী অফিসের এক দপ্তরখানা। পাশাপাশি পাঁচটি চেয়ারে বসে কাজ করে পাঁচটি মেয়ে-কেরানি। যে-কাজ তারা করে, তাকে কাজ না-বলাই ভালো। কেউ বা করে সারাদিনে দু'চারটে চিঠিপত্রের 'রিসিভ,' কেউ বা করে 'ডেস্প্যাচ', কিংবা কেউ বা করে দু'একটা 'কপি'। কাজ আসলে তারা যা করে, সে হল খোস-গল্প—নিজেদের দাম্পত্য-জীবন, অফিসের অন্যান্য মেয়েদের কেচ্ছা-কাহিনী এবং সিনেমা-নায়িকাদের কাল্পনিক প্রেম,—অর্থাৎ নানা বস্তুর পাঞ্চিংএ রসালোচনা। আর এর উপরে ড্রয়ারে বই রেখে গল্প-উপন্যাস পড়া কিংবা এম্ব্রয়ডারী করা কিংবা প্রাঙ্গণে অথবা নিকটবর্তী নিউ মার্কেটে দলে দলে ঘুর-ঘুর বেড়ানো।

এই এদের মধ্যমনি হলেন সাহানা-দি।

সাহানা-দি তাঁর দীর্ঘ তের বছরের বিবাহিত জীবনে একটি কোমল শিশু-সন্তানের স্পন্দন বুকে অনুভব করার জন্য প্রথম দাম্পত্য-জীবনে কী না অসাধ্য সাধন করেছেন, কত দেব-দেবীর না পূজো দিয়েছেন। তারপর হতশ্বাস হয়ে উচ্চপদস্থ চাকুরে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনীরূপে কর্মের মধ্য দিয়ে হাসি-তামাসার স্রোতে লঘুভাবে জীবনটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আজ তাঁর যৌবনের সন্ধ্যা।

নেলি ঠিক তন্বী না হলেও যৌবনের মধ্যাহ্ন-দীপ্তি এখনো তার দেহতটে পরিব্যাপ্ত—বহুদিন ধরে এক সহকর্মীর সঙ্গে প্রেম করে সম্প্রতি তাকে বিবাহ-ডোরে বেঁধেছে।

তিরিশ বছর বয়সে তিনটি সন্তানের জননী হয়ে গরীব কেরানির স্ত্রী চিত্রা দাম্পত্য ও সংসার—এই উভয় জীবনে হয়ে উঠেছে বীতস্পৃহ।

আর এদের ছ'পাশে বসে আরো ছুটি নারী—গৌরা আর ইরাবতী।

অধ্যাপকের স্ত্রী গৌরী বি-এ পড়তে পড়তে হয় বিধবা,—তখন তার কোলে এক বছরের শিশুকন্যা। নিজে বাঁচতে আর কন্যাটিকে মানুষ করতে আট বছর আগে ঢোকে এই সরকারী অফিসে। আকস্মিক চরম ভাগ্য-বিপর্যয়ে তার হৃদয় দগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত। তাই অফিসে কাজের অবসরেও সে যোগ দেয় না সাহানা-দিদের রসালাপে, করে তার নিজের কোনো কাজ।

কিন্তু ত্রয়োবিংশা ইরাবতী এখনো পায়নি পুরুষ-সঙ্গের রোমাঞ্চকর মিলন। তাই অফিসে হাঁ-করে গিলে খায় সাহানা-দিদের আলোচনামৃত।

একদিন যখন সে এমনি তন্ময় হয়ে শুনছিল নেলি-অমিত-দাম্পত্যের রসঘন আলোচনা, তখন সাহানা-দি হঠাৎ তাকে বলে বসলেন, 'ইরা, অমন হাঁ করে গিল্‌ছিস্ কী! নেলির মত একটা জুটিয়ে ফ্যাল্ না, তাহলেই তো আসল রসটা ভোগ করতে পাস্।'

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল সাহানা-দির এই আকস্মিক নতুন রসিকতায়; কিন্তু লাল হয়ে গেল ইরার নাক-কান।

লজ্জায় ইরা মরে গেলেও বাঁচবার জন্যে একটি জোয়ান সগর্ব পুরুষকে নিয়ে নীড়-রচনের আশা যে অন্তরে পোষন করেনি এমন নয়; বরং ছ'একবার এগোতে গিয়ে সাহসে কুলোতে না-পেরে ফিরে এসেছে।

একমাত্র অভিভাবক কালেক্টারী-অফিসের কেরানি তার দাদা সস্ত্রীক থাকে এক মফঃস্বল সহরে; আর দূর থেকে বোনের বিয়ের ব্যাপারটাকে মুলতুবী করে তুলে রেখেছে বোনের চেষ্টার উপর। ফলে স্বাধীন ইরাবতী থাকে মেয়েদের এক বোর্ডিং হাউসে আর চাকরী করে এই অফিসে।

বাইরে তার কর্মময় পথ-চলা জীবনে ইরাবতী দু'বার দুটি পথিক পুরুষকে নিয়ে ঘর-বাঁধবার প্রয়াস পেয়েছিল। প্রথম, যে সাব-অফিসে সে চাকরাতে প্রথম যোগদান করেছিল সেখানের এক সুদর্শন কেরানিকে, দ্বিতীয়বার, যে সাব-অফিসে সে প্রথমবার বদলী হয়েছিল, সেখানে এক তরুণ সাব ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে নিয়ে। কিন্তু হৃদয়ের গোপন কথাটি প্রকাশ করতে গিয়ে দু'বারই কম্প্রবক্ষে থেমে গিয়েছে।

কিন্তু হেড-অফিসে এসে সাহানা-দির কাছে শুনল এখানের নানা জনের নানা কাহিনী—প্রেম করে ঘর-বাঁধা, প্রেম করে শেষ পর্যন্ত ঘর-না-বাঁধা, আবার ঘর বেঁধে তা ভাঙ্গা, আর দেখল ঘর-বাঁধার জন্য কতজনের কত গুঞ্জন, কত কলা-কৌশল। নিজের চোখেই তো সে দেখল অমিত-নেলির প্রেম আর বিবাহ।

আর তাই দেখে ইরাবতীর মনে বলিষ্ঠ আকারে দেখা দিল নীড় বাঁধার আশা। কিন্তু পাত্র নির্বাচন নিয়ে যখন তার মনে চলছিল বোঝাপড়ার মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব, এমনি সময়ে সেদিন সাহানা-দি তাকে হঠাৎ বলে বসলেন ঐ-কথা। সাহানা-দির মুখ দিয়ে আপন অন্তরের গোপন কথাটি এইভাবে আচম্বিতে প্রকাশ হওয়ায় ইরাবতী সেদিন তাই লাল হয়ে উঠেছিল।

আশ্চর্য, পাত্র-নির্বাচন-ব্যাপারে সে আর দেরী করল না। বেছে নিল সমর বাবুকে—তারই সেক্সনের সেই "স্মাট-বয়"টিকে। লম্বাপনা ফর্সা টুকটুকে চেহারা সমরের। ব্যাক-ব্রাশ চুলে স্যুটে মোড়া টিপ্‌টপ্‌ পোষাকে অফিস আসে প্রত্যহ। কর্মচারী-ইউনিয়ন, ফুটবল-এসোসিয়েশন

উভয়েরই সে ইউনিট সেক্রেটারী। ফলে অফিসের পুরুষ মেয়ে সকলের সঙ্গে তার সমান অবাধ মেলামেশা।

আর তাই স্বকার্য সাধন নিমিত্ত ইরাবতী মেয়েদের তরফ থেকে ঢুকল ইউনিয়নের এই ইউনিটের সভ্যরূপে।

এ পর্যন্ত ইরার সঙ্গে সমরের প্রায় চলত অফিস সংক্রান্ত কথাবার্তা। আর এরপর সুরু হল ইউনিয়ন সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক।

'আপনার দ্বারা কিস্সু হবে না! দু' দিনেও একটা টাকা তুলতে পারলেন না।' সভ্যদের চাঁদা তোলার ব্যাপারে সমরকে বলে উঠলো ইরাবতী।

'কী করি বলুন, কেউ যদি না দেয়।'

'দেবে না কেন! নিশ্চয়ই দেবে। এই নিন তিন টাকা।'

'য়্যাঁ! এরই মধ্যে তিন টাকা আদায় করে ফেল্লেন! আপনি তো খুব চাঁদা তুলতে পারেন।'

'দায়িত্ব যখন নিয়েছি, যথাসাধ্য তা পালন করবো। আর দু তিন দিনের মধ্যে মেয়েদের সব চাঁদা তুলে ফেলবো।'

'দয়া করে আপনি ছেলেদেরও ভারটা নিন না। আপনার কাছে ওরা কেউ আর না বলতে পারবে না।' সমরের ঠোঁটের কোনে হাসি।

'আহা! খুব হয়েছে!'

আর একদিন অস্থায়ী অতিরিক্ত কর্মচারীদের মফঃস্বলে পাঠানো-সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে সে হঠাৎ বলে বসলো, 'না—না—না, এ হতেই পারে না।'

'কী হতে পারে না?' প্রশ্ন করল সমর।

'মেয়েদের মফঃস্বলে পাঠানো চলবে না।—এ কাজ চলবে না।' ইরা চেঁচিয়ে যেন শ্লোগান আওড়াল।

'তবে'—

'মেয়েদের জন্য কলকাতায় স্থায়ী বিকল্প চাকরী দিতে হবে। আমাদের এ আবেদন কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানো হোক এবং সেখান থেকে মন্ত্রীর কাছে।'

এমনিভাবে তাদের মধ্যে চলে ইউনিয়ন সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক।

কিন্তু ইউনিয়ন-সংক্রান্ত এই তর্কবিতর্ক, এই কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে ইরাবতী কাছে টানতে চায় সমরকে,—ভিতরে থাকে হৃদয়ের টান, বাইরে দেখায় ভদ্রতা, সৌজন্য, বন্ধুত্ব। তাই অফিস ছুটির পর মাঝে মাঝে সমরকে নিয়ে সে ঢুকে পড়ে চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয়। তারপর পর্দার অন্তরালে গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আবার কোনো-কোনোদিন বা বাড়ী ফেরবার পথে ট্রাম থেকে সমরকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ীতে, নিজের হাতে তৈরী করে তাকে খাওয়ায় চা-খাবার।

আবার মাঝে মাঝে সমরকে সঙ্গী করে সিনেমা দেখতে যায়,—মেট্রোয়, লাইট-হাউসে, নিউ-এম্পায়ারে। বাঙলা-ছবির চেয়ে ইংরেজি-ছবি তার ভালো লাগে। রক্ত-মাংস, শিরা উপশিরায় গঠিত যে জীবন, সত্যিকারের বাস্তব-মূর্তিতে তা রূপায়িত হয়ে ওঠে না কি ইংরেজী ছবিতে। সে ছবি দেখতে দেখতে সে রোমাঞ্চ অনুভব করে। কৌপীনবতী মার্কিণ রূপসীদের দেহকেন্দ্রিক প্রেমাভিনয় দেখে সে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠে ভয়ানক; পুরুষ-স্পর্শহীন তার উত্তপ্ত যৌবন তার যুবতী-হৃদয়কে করে তোলে আকুল। কোনো উত্তেজক দৃশ্যে উত্তেজিত হয়ে পাশের সঙ্গী সেই আধো-আঁধারে সমরকে কল্পনায় ভেবে নেয় তার সেই প্রিয় প্রেমিক। আর এমনি এক উত্তেজক অবস্থায় একদিন অকস্মাৎ সে নিজের মুঠোয় টেনে নিল সমরের বাম হাত।

সমর শিউরে ভীষণ কেঁপে উঠল। এবং পরমুহূর্তে হাতটি টেনে নিয়ে পাথর হয়ে গেল। আর অবস্থাটা উপলব্ধি করে ইরা লজ্জায় মরে গেল। তারপর তারা পর্দায় কি দেখল কে জানে; কিন্তু বেরিয়ে

আসার সময় আলোয় কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারল না,—ফুটপাতে নেমে শুধু 'চলি' বলে সমর অন্যমুখে জনতায় মিশে গেল।

তারপর···

তারপর কেটে গেছে আরো কিছুদিন।···

একদিন পূজোর ছুটির প্রাক্কালে আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় ইরাবতী মনের কথা জানাল সমরকে—গড়ের মাঠের সেই নির্জন অংশে মুখোমুখি বসে—যেখানে তারা প্রায়ই গিয়ে বসে বসে গল্প করে।

'আর কতদিন আমাদের এমনি করে কাটবে, আমি যে আর পারছি না।' প্রেমালাপের মধ্যে মরিয়া হয়ে এক সময় বলে বসলো ইরাবতী।

সুর কেটে গেল সমরের। ঠিক হয়ে বলল, 'তুমি তো আমার সবই জান। বাবা মারা যাবার সময় আমার হাত ধরে বলে গেছেন, 'তোর মা রইল, ভাই বোন রইল—এরা যেন ভেসে না যায়।' ভাই-বোনকে ইস্কুলে পড়াচ্ছি। তাদের খরচ আর মায়ের খরচের জন্য বেতনের তিন ভাগ টাকা তো দেশেই পাঠাই। বাকী ক'টা টাকায় কি কষ্টে যে মেসে থাকি সে তো তুমি জান। তোমাকে নিয়ে দাম্পত্য সুখ-স্বপ্নের কথা আমি ভাবি, কিন্তু যখনি বাবার প্রতিশ্রুতির কথা ভাবি, তখনই পিছিয়ে পড়ি।'

'আমাদের দু'জনের আয়ে সংসার তো ভালোই চলবে।'

'আপাততঃ ভালোই চলবে। তারপর সংসার-জালে জড়িয়ে পড়লে স্বার্থপর হয়ে উঠবো, বাবার কথা রাখতে পারবো না। তাই ঠিক করেছি, ওদের জন্যে জীবনটা আমি এমনিই কাটিয়ে দেব।'

'তবে কেন এতোদূর এগুলে?' ইরাবতীর কণ্ঠস্বরে কিছু ঝাঁঝ।

'তুমিই তো আমাকে এগিয়ে এনেছ—ইউনিয়ন থেকে রেস্তোরাঁয়, রেস্তোরাঁ থেকে সিনেমায়, সিনেমা থেকে গড়ের মাঠে। তুমিই আমাকে

এগিয়ে এনেছ, আর চুম্বকের টানে আমি শুধু তোমার পেছনে ঘুরেছি। কেন জানি না, তোমার সে আকর্ষণকে এড়াতে পারিনি। তাতে যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করো।'

তারপর…

তার পরদিন অফিসে দেখা গেল না ইরাবতীকে। শুধু দেখা গেল তার হস্তলিখিত একটি দরখাস্ত—শরীর অসুস্থের জন্য সে অফিসে আসতে পারবে না এবং সেজন্য এক মাসের 'আর্নলীভ' যেন তাকে মঞ্জুর করা হয়।

তারপর এক মাস পরে অফিসে ঢোকার সময় তাকে দেখে অবাক হল সবাই। কিন্তু আকাশ থেকে পড়ে গেল শুধু দু'জন সমর আর সাহানা-দি। বিস্মিত সমর অপলক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইল; কিন্তু কোনো কথা না বলে খানিক পরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সাহানা-দি হাঁ-করে তাকিয়ে থেকে আঁৎকে উঠলেন, য়্যাঁ! এ কী রে! কবে হ'লি! আমাদের জানালি না। এই বুঝি তোর শরীর খারাপ হওয়ার লক্ষণ?'

এতো প্রশ্নে ইরাবতী যেমন ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ল, এত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টিতে লজ্জায় তেমনি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ইরাবতীর সিঁথিতে সিঁদুরের সরু রেখা, হাতে জড়োয়া অলঙ্কার, গায়ে দামী পোষাক, আর মুখে নম্র-বধূর ব্রীড়া। তেমনি লজ্জা-নম্র বধূর মতো মুখভার করে বলল, 'শরীরটা খারাপ বলে বর্ধমানে মাসীমার ওখানে গিয়েছিলাম। মাসীমাই বন্দোবস্ত করে বিয়ে দিয়ে দিলেন।' সমর যেন শুনতে পায় এমনি জোরে কথাটা বলে তার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল।

তারপর সাহানা-দি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোর বরের বয়স কত, চেহারা কি রকম, কত টাকা বেতনের কি চাকরী করেন, ইত্যাদি। ইরাবতী সব প্রশ্নের উত্তর মধ্যম পন্থায় দিল।

'তাহলে তোদের এখন মরশুমের রাত্রি চলছে বল।' সাহানা-দির কথায় সেই কৌতুক।

'ধেৎ, ওরা যে শুনতে পাবে।' ঠিক নেলির কথা-বলার ভঙ্গিতে তারই কথার প্রতিধ্বনি করল ইরাবতী।

'যাক্ এতদিনে তোর একটা হিল্লে হল। বড় খুসী হলাম। স্বামী না-থাকলে মেয়েদের জীবন সত্যি শূন্য, তার কোনো মানে হয় না।'

'আঃ! একটু আস্তে সাহানা-দি নেলির ঢঙে কথা বললো ইরা।

'চুপ কর তুই, আস্তেই তো বলছি। বলি সমর বাবুর সঙ্গে এতো ঢলা-ঢলি করলি, কিন্তু শেষটায় এ কী করলি। আমি তো ভেবেছিলাম নেলি-অমিতের মতো তোরাও জোড় বেঁধে যাবি।'

'আঃ! অস্ফুটে আঁৎকে উঠল ইরা। 'তোমার পায়ে পড়ি, সাহানা-দি, তুমি চুপ কর।' ইরাবতা লজ্জিত লাল মুখে আড়-চোখে তাকাল সমরের মুখের দিকে। সাহানা-দির শেষ কথা শুনতে পেয়ে সমর মুখ ফেরাল ইরাবতীর দিকে। দু'জনে চোখাচোখি হতেই সমর ঘাড় ফেরাল অন্যদিকে, ইরা মুখ নামাল নীচের দিকে।

তারপর

তারপর ইউনিয়নের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিল ইরাবতী এবং বন্ধ করল সমরের সঙ্গে কথাবার্তা-বলা।

এবং ইতিপূর্ব্বে ছুটির মধ্যে পুরাতন বোর্ডিং হাউস ছেড়ে দিয়ে সে উঠে গেছে নতুন এক বোর্ডিং হাউসে। আর চাল-চলনও বদলে দিয়েছে সম্পূর্ণরূপে।

আর একদিন...

'কি রে, তোর বরকে দেখাবি না?' সাহানা-দি জিজ্ঞেস করলেন ইরাবতীকে।

'দেখাব না কেন। কিন্তু কী করি বল। ওকে একথা বল্লেই

হেসে বলে, 'আমি চিড়িয়াখানার কোনো নতুন জীব না কী? আমাকে তোমার বন্ধুরা দেখতে চায়। বলে দিও, হাত-পা-ওয়ালা একটা মানুষ দেখতে যেমন হয়, আমি তেমনি। বল দেখি, এরপর আর কী করি।'

'বেশ তো, একটা রোববারে অতর্কিতে তোদের বাসায় হানা দিলেই তো হোল।'

এ কথায় হঠাৎ হকচকিয়ে গেল ইরাবতী। তারপর বলে উঠলো, 'না, ওর তো আমাদের মতো চাকরী নয় যে, রোববার ছুটি। ওর ছুটির কোনো নির্দিষ্ট দিন নাই, কোনো সপ্তাহে সোমবার, কোনো সপ্তাহে মঙ্গলবার, কোনো সপ্তাহে বা বুধবার, এমনি। আবার কোনো সপ্তাহে হয়তো ছুটিই পেল না। তাই ওর আসার কোনো নির্দিষ্ট দিন থাকে না। হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়।' তারপর এ আলোচনাকে চাপা দেবার জন্য হঠাৎ সে নেলির সেই লজ্জা-নম্র ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, সাহানা-দি, পুরুষ মানুষরা এতো অসভ্য হয় কেন বলতে পারো?'

'কেন, কী হয়েছে?

'ও আমাকে বলে, চাকরী ছেড়ে দাও, সপ্তাহে আর কলকাতায় ছুটতে পারিনে।'

'ঠিকই বলেছেন। এখানে আর ঢলানি করে বেড়াস্ না। যা, এবার গুছিয়ে ঘর-সংসার পাত, নিজেও সুখী হ, স্বামীকেও সুখী কর।'

'বরাবর একসঙ্গে থাকতে আমার ভালো লাগে না, সপ্তাহে একবার যে তবু আমল দেই, সেই তার ভাগ্য। চাকরী যদি ছাড়তে হয় সেই ছেড়ে আসুক। আমি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি না, বা-বা'—ঠোঁটাগ্র কুঞ্চিত করে এক প্রকার মুখভঙ্গি করল ইরাবতী।

'নে, ও-সব ন্যাকামী রেখে দে; বলি আর ঢলানি দেখাসনে।

উনি এবার কলকাতায় এলেই ওঁর সঙ্গে চলে যা। স্বামীর কাছে বরাবর থাকবি সে কী কম ভাগ্য।'

আর একদিন—

ইরা বারটায় অফিসে এল।

'কী রে! এতো দেরী হল যে।' সাহানা-দি শুধালেন তাকে তার দেরীর কারণ।

'ও কাল রাত্রি দশটায় হঠাৎ পৌঁছল, আবার আজকেই চলে গেল; ওকে ইষ্টিশনে ছেড়ে দিয়ে আসায় তাই দেরী হল।' সেই লজ্জা-নম্র ঢঙে কথা বলল ইরাবতী।

'কাল রাত্রে নতুন কী অভিজ্ঞতা হল বল।' সাহানা-দি ধরে বসলেন ইরাকে।

'নতুন অভিজ্ঞতা আবার কী! এ তো সবার সমান, সব পুরাতন। বসে বসে কোনো কাজ নেই তো—' একটু রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো চিত্রা।

এমনি করে চলে ওদের রসালোচনা। নেলি আর হালে-বিবাহিতা ইরাবতীকে নিয়ে।

কিন্তু একদিন আচম্বিতে ঘটে গেল একটা ঘটনা—নেলি তার স্বামীকে 'ডাই-ভোর্স' করল।

'কেন, কী হয়েছিল!' বিস্মিত সাহানা-দি প্রশ্ন করলেন নেলিকে।

'বলো না সাহানা-দি ও একটা স্কাউণ্ড্রেল, রাত্রি করে বাসায় ফিরি বলে ও আমাকে যা-তা বলে। এই নিয়ে সেদিন কথাকাটাকাটির সময়, ও এমন ইডিয়ট, আমার গালে ঠাস্ করে এক চড় মারল।'

'ওঃ, এই—' চিত্রা ভ্রূকুটি করে উঠল। 'এই নিয়ে স্বামীকে বাদ দিয়ে দিলি? এই তোদের গভীর-প্রেম—এরই নাম 'লাভ-ম্যারেজ।' একটা চড় মেরেছে, আর তাতেই স্বামী-প্রেম একেবারে এমন উবে

গেল যে স্বামীকে একেবারে তালাক দিয়ে ফেললি। এ তো আমি ভাবতেই পারিনি।' নাক-সিঁটকে মুখ ঘোরাল চিত্রা ফাইলের পাতায়।

যাই হোক, নেলি মাথায় সিঁদুর পরা বন্ধ করল, হাতের অলঙ্কার কমাল, আর অফিসের হাজিরা-বইয়ে মিসেস নেলি রায়ের পরিবর্তে মিস নেলি মুখার্জী লেখাল।

কিন্তু নেলির এই ডাইভোর্স ইরাবতীর জীবনে দেখা দিল এক মারাত্মক অঘটন রূপে। সাহানা-দি এখন তাকে নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

ইরাবতী ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ল। যদিও প্রথম প্রথম তার বেশ ভাল লেগেছিল; কিন্তু এখন যে মারা-পড়ার যোগাড়। কাঁহাতক কত আর বানিয়ে-বানিয়ে বলা যায়। কিন্তু উপায় নেই, বলতে হয়। তা না হলে আর আত্মসম্মান থাকে না।

কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রাখতে তার আত্মারাম যেন যায়-যায়। সাহানা-দি তাকে নিত্য নূতন প্রশ্ন করেন, আর তাকে তার বিশ্বাস যোগ্য উত্তর দিতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে সে এক মারাত্মক সিদ্ধান্ত করে বসল—কোনো বিশেষ কারণে নেলির মতো সে স্বামীকে ডাইভোর্স করেছে,—এইরূপে আবির্ভূত হবে অফিসে। কিন্তু এতেও সে ভীত হয়ে উঠল। নেলির আড়ালে সাহানা-দিরা তার স্বামী-ত্যাগ সম্পর্কে তাকে কত নিন্দাই না করেন। না, এ-পন্থাও সুবিধার নয়।

অতএব ..

অতএব এর চেয়েও একটি সাংঘাতিক সিদ্ধান্তে সে উপনীত হল—সে গৌরী-দির মতো হয়ে অফিসে আসবে। কারণ, গৌরী-দিকে নিয়ে কিম্বা তার সম্বন্ধে কেউ কোনো আলোচনা করে না। সুতরাং সাহানা-দির আক্রমণ থেকে রক্ষা-পাওয়ার এ পথই প্রশস্ততর।

কাজেই দিন কয়েক ছুটি নেওয়ার পর সে একদিন অফিসে এলো বিধবা বেশে—উস্কোখুস্কো চুলে; করুণ, শোকাচ্ছন্ন কৃশ মূর্তিতে।

'য়্যাঁ!' ভয়ানক আঁৎকে উঠলেন সাহানা-দি। তিনি যেন বজ্রাহত। 'এ কী! কী হয়েছিল?'

'টাইফয়েড।' কাঁদ-কাঁদ স্বরে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল ইরাবতী।

'টাইফয়েড! ভাল ডাক্তার দিয়ে কী ট্রিটমেণ্ট কর নি?' দুঃখিত কণ্ঠে বলল চিত্রা, কণ্ঠে তার সহানুভূতি।

'ভাল ডাক্তারই দেখান হয়েছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেল।' বেশ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ইরাবতী।

'আহা, এরই মধ্যে জীবনটা তোর শেষ হয়ে গেল।' সাহানা-দি সমবেদনা জানালেন।

'ক'মাসই বা বিয়ে হল, এরই মধ্যে স্বামী হারালি। কী মন্দ ভাগ্য তোর। বেচারী!' চিত্রা বলে উঠল।

ইরার ক্রন্দন আরো বেড়ে গেল। বেচারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সাহানা-দি তার মাথাটাকে কোলে টেনে নিয়ে হাত বুলোতে লাগলেন। 'কী করবি বোন্, চুপ কর্। তোর তো আর এতে হাত নাই।'

'ফুল না ফুটতেই ঝরে গেল।'

'আহা, বেচারী।'

'কপাল খারাপ।'

'চুপ করুন, কেঁদে আর কী করবেন।'

ইরাবতীর এই অবস্থা দেখে কক্ষের সবাই মর্মাহত। তারা তার চারদিকে ঘিরে তাকে এইভাবে জানাতে লাগল সহানুভূতি, সমবেদনা। তারা যতোই তাকে এমনি সহানুভূতি জানায়, তার ক্রন্দনের স্বর-মাত্রা ততোই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা যতোই তাকে থামাতে চেষ্টা করে,

তার ক্রন্দনের স্বর-ভঙ্গি ততোই এক বিচিত্র পথে বাঁক নিতে থাকে। তারপর হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠে সে চীৎকার করে উঠল, 'না··· না··· না, আমি বিধবা হইনি, আদৌ বিধবা হয়নি। তোমরা সরে যাও, সরে যাও। সত্যি আমি বিয়ে করিনি। সত্যি বিয়ে করিনি···' বলতে বলতে গোঁ-গোঁ করে চোখ বুজে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য সবাই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। সবাই যেন নিথর পাথর।

আর সমর...

সে শুধু এতক্ষণ ধরে নিজের চেয়ারে বসে ঐ সব শুনছিল এবং দেখছিল। কিন্তু ইরাবতীর শেষ কথায় তার মুখ মড়ার মতো একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু ইরার মূর্ছা যাওয়ায় আচম্বিতে সে চীৎকার করে উঠল, 'আপনারা সরে যান, সরে যান,' বলে ভিড় ঠেলে চেয়ারের কাছে এগিয়ে এল। তারপর বিদ্যুৎ বেগে তাকে কোলপাঁজা করে শূন্যে তুলে নিয়ে মেঝেতে শোয়াল।

তারপর···

তারপর সমর তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার চোখে-মুখে-কপালে জলের ছিটে দিতে লাগল।

পৌষ, ১৩৬০।

স্বর্ণরেখা

কাহিনীটি শোনা আমার সহকর্মী বন্ধু সত্যময়ের কাছ থেকে। কাহিনীটি নাকি সত্যি এবং ঘটেছিল তার জ্ঞাতি সম্পর্কের এক দাদার জীবনে। সে এতোদিন আমাকে কাহিনীটি বলেনি এবং কোনদিন বলতো কী না জানি না; কিন্তু তার উক্ত দাদা আর একটি অঘটন ঘটানোয় সে আমাকে কাহিনীটি শুনিয়েছিল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা দুজন সামনের ক্যানেলের বাঁধে বেড়াচ্ছি—এমন সময় তার উক্ত দাদাটাকে পাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সত্যময় তো একেবারে অবাক্। সে এগিয়ে গিয়ে দাদাকে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি যে এখানে?" তিনিও তেমনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওকে পাল্টে প্রশ্ন করলেন, "তুই যে এখানে?"

"আমি তো এখানকার স্কুলেই মাষ্টারী করি," স্কুলের 'বোর্ডিং হাউস' দেখিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বল্লে, "থাকি ঐ বোর্ডিং-এ। কিন্তু তুমি কেন এখানে?"

"বলছি, চল্, তোর ঘরে গিয়ে বসি"।

সত্যময়ের যেন আর তর সয়না, বসেই বল্লো, "হ্যাঁ, এবার বলো।"

"হ্যাঁ রে, ও বাড়ীতে কী একটি বিয়ের যোগ্যা মেয়ে আছে?" তিনি ভাইয়ের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমরা বুঝতে পারলুম, কার কথা বলা হচ্ছে। তাই বন্ধুবর হেঁয়ালি করে বল্লো, "হ্যাঁ, আছেন তবে বিয়ের যোগ্যা নয়, বিয়ের অযোগ্যা—অর্থাৎ ষোল বছর আগেই তার ষোল বছর কেটে গেছে—"

ভাইয়ের হেঁয়ালীর অর্থটা উপলব্ধি করে দাদা গুম হয়ে গেলেন।

"তাছাড়া তিনি রূপে মা ভৈরবী ; এর উপর তার অনেক কেলেঙ্কারী আছে।" সত্যময় থামলো। তারপর কী যেন ভেবে বলে উঠলো, "এতোক্ষণে বুঝিলাম," বলে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লো, "কেন তুমি এখানে—" তারপর স্বাভাবিক সুরে বল্লো, "তাহলে তুমি মেয়েটিকে দেখতে এসেছো—"

"হ্যাঁ," তিনি একটা ঢোক গিলে বলতে লাগলেন, "কাল ট্রেনে ও বাড়ীর নির্মলবাবুর-সংগে আলাপ হোল। তিনি তাঁর বোনকে আমাকে দেখাবার জন্যে এনেছেন।"

"দেখেছো কী ?"

"না, কালরাত্রি এগারোটায় পৌঁচেছি—"

"সংগে তোমার কী আছে—?"

"চামড়ার একটা ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ—আর গোটা কয়েক জামা কাপড়—"

"তবে ঠিক আছে, তা আর আনতে যেতে হবে না, আমাদের এখানে চা খেয়ে পিছন দিক দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ো—'যঃ পলায়তি, সঃ জীবতি'—"

"কিন্তু নির্মলবাবুর সংগে দেখা না করলে ভদ্রতা বলে একটা···

"ভদ্রতা ·····" সত্যময় হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো, "তোমার নির্মল বাবুটি যে কী রকম ভদ্র তা তোমার জানা নেই, আমাদের আছে—আমি যা বলছি, শোন, ছোট ভাইয়ের কথা অগ্রাহ্যি করোনা—"

এর পর দাদা আর কোন কথা বল্লেন না। ছোট ভাইয়ের উপদেশ মতো চা খেয়ে চুপি চুপি সরে পড়লেন।

দাদার পলায়নের পরেই ভাইয়ের সে কী হাসি। হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে সত্যময় যা বল্লো, তা আপনাদের তারই ভাষায় শোনাচ্ছি :—

আমার এই দাদা কমার্সে এম-এ। একটা মার্চেন্ট অফিসে ম্যানেজারী করে শ' সাতেক টাকা পায়, আর এদিকে জমিদারী আছে, আর জেঠাবাবু, দাদার বাবা, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। তাছাড়া, দাদার চেহারাটা দেখলে তো—যেন কার্তিক, যেমনি লম্বা-চওড়া; তেমনি সুন্দর, ফর্সা। সুতরাং দাদার যখন বিয়ের কথা উঠল; তখন এহেন পাত্রকে বাংলাদেশের কনেরা বররূপে, আর কনের মা-বাপেরা যে জামাতারূপে পেতে চাইবে—তাতে আর আশ্চর্য কী! দাদা কনে দেখতে দেখতে তো সারা বাংলাদেশটা চযে ফেল্‌ল এবং বছর দুই ধরে ডজন দুই কনে দেখে ক্ষান্ত হল—কিন্তু বিয়ে করলে না; কারণ একটিও তার পছন্দসই হল না। কারো রং পছন্দ হল তো, মুখ পছন্দ হল না, কারো মুখ পছন্দ হল তো, রং পছন্দ হল না, কারো রং মুখ পছন্দ হল তো চুল পছন্দ হল না, কারো সবই পছন্দ হল তো গান, বিদ্যা কম পড়ে গেল—এমনি চোখ, নাক, ঠোঁট ইত্যাদির একটা না একটা খুঁত সে প্রত্যেকের মধ্যেই দেখতে পেল। জেঠাবাবু আর জেঠাইমা তো দাদার বিয়ের হাল ছেড়ে দিলেন। বন্ধুবান্ধব, আমরা ভাবলাম, দাদার যোগ্য মেয়ে যখন বাঙলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ইয়োরোপ আমেরিকায় চেষ্টা করা যাক্ কিংবা সৃষ্টিকর্তাকে একটি স্পেশ্যাল নিখুঁত কনে তৈরীর অর্ডার দেওয়া হোক। কিন্তু তা করতে হল না—কারণ এই বাঙলা-দেশেরই একটি মেয়েকে দৈবাৎ দাদার পছন্দ হয়ে গেল। সত্যিই পছন্দ করার মত মেয়ে, এমন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি, তাকালে চোখ ফেরান যায় না—অপূর্ব সুন্দরী, যেন নন্দনবাসিনী অনন্ত যৌবনা উর্বশী; কিন্তু ইনি বালিগঞ্জবাসিনী রুবি রায়—বাঙলার এক প্রাক্তন মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কলকাতার এই বিক্ষুব্ধ জনারণ্য থেকে বৌদিকে আবিষ্কারের জন্য আমরা সবাই দাদাকে বাহবা দিলাম।

এই বলে সত্যময় থামলো।

কাহিনীটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হচ্ছে বলে শোনার জন্য মনটা অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, তাই বল্লুম, "থামলে কেন......"

সত্যময় বল্লো, "এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, এতো হল ভূমিকা, আসল ঘটনা এখনও আরম্ভই হয় নি, ধৈর্য ধর।" বলে সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে মুখটাকে উপর দিকে তুলে ধোঁয়াটা কুণ্ডলী করে ছাড়তে লাগল।

তারপর বলা স্থরু করলো......

বিয়ে—বৌভাতের আনন্দ-উৎসব কাটিয়ে দাদা মাসখানেক পরে কলকাতায় তার কর্মস্থলে চলে গেল। বৌদি রইল জেঠাবাবুর কাছে মেদিনীপুর সহরে। দাদার কলকাতায় চলে যাবার পর থেকেই বৌদি নিজের ঘরটিতে খিল দিয়ে দিনরাত একা একা থাকত। কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই। শুধু খাবার সময় নেংচিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে নাক সিঁটকিয়ে মুঠোখানি খেয়ে আবার ঘরে ঢুকত। সবাই ভাবলে, দাদার বিরহে বৌদি বুঝি একেবারে মনমরা হয়ে গেছে। কিন্তু উল্টো বুঝলি রাম! আসলে আমরা বৌদির মনোভাব বুঝতে পারিনি মোটেই।

দিন কয়েক পরে বৌদি জেঠাবাবুকে মুখে নয়, লিখে জানাল। গৃহস্থের রান্না তার সহ্য হচ্ছে না, সে ষ্টোভে আলাদা রান্না করে খাবে এবং সেজন্য দৈনিক চাই দুপিস মাছ, দুটো ডিম ইত্যাদি।

জেঠাবাবু জেঠাইমাকে কথাটা জানালেন। জেঠাইমা কথাটা শুনেই একেবারে ফেটে পড়লেন।

তাঁর রাগের আরো অনেক কারণ ছিল। যেমন, মাথায় কাপড় না দিয়েই সকলের সামনে বৌদির চলাফেরা করা, দাদাকে স্রেফ নাম ধরে ডাকা এবং তাঁকে বৌদির আদৌ কেয়ার না-করা। বৌদিকে শুনিয়ে জেঠাইমা বলতেন, শ্বশুর বাড়ীতে আসার দশ বছর পর্যন্ত ঘোমটার

ভেতরে থেকে কেউ তাঁর মুখ দেখতে পায়নি। আর স্বামীর নাম ধরে ডাকা তো দূরের কথা, স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী—অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর যে কোন পূজনীয় মেয়ে পুরুষের নাম মুখে আনতেন না এবং ঐ নামের বস্তুদেরও প্রতীক নাম ব্যবহার করতেন।

সুতরাং বুঝতেই পারছ, জেঠাইমার অবস্থাটা!

বৌদির আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চাল-চলন এবং গায়ের দুধে-আলতা রং দেখে জেঠাইমা শেষ পর্যন্ত প্রায় বিশ্বাস করে ফেললেন, বৌদি য়্যাংলো মেয়ে।

জেঠাবাবুর মুখে এই কথা শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন, "এত মেয়ে দেখে শেষকালে রমেন একটা ফিরিঙ্গি মেম বৌ করে আনল!"

জেঠাবাবু জেঠাইমাকে বুঝিয়ে বললেন, "চুপ কর, মন্ত্রীর বাড়ীর মেয়ে, তায় আবার কলকাতার কলেজে পাশ করা; নূতন এসেছে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে!"

বৌদি প্রত্যহ রুটিনমাফিক জিনিষপত্র পেতে লাগল এবং নিজে ষ্টোভে রান্না করে খেতে লাগল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সত্যময় বলে চললো, কিন্তু অদ্ভুত হলেও বৌদি মানুষ এবং মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব। এমনি ভাবে চিড়িয়াখানার মতো ঘরে আবদ্ধ থাকতে থাকতে বৌদি ক্রমে হাঁফিয়ে পড়ল এবং একদিন বিকেলে একাই বেড়াতে বেরুল। আমাদের কাউকে সঙ্গে নিল না। মেদিনীপুর সহরটা বালীগঞ্জ নয়, সেখানে বাড়ীর বৌরা তো দূরের কথা, গিন্নী-বুড়িরাও একা একা বেড়াতে বেরোয় না। তাই জেঠাবাবু এভাবে একা একা বেড়াতে বেরান যে অসম্মানকর বৌদিকে তা বুঝিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে তা করতে নিষেধ করলেন।

ফলে ঘটল এক অঘটন।

বৌদি দাদাকে চিঠি লিখল। চিঠিটা অবিশ্যি ইংরেজীতে। তার তর্জমা-ই তোমাকে বলছি।

আমার প্রিয় রমেন,

আমাকে কয়েদখানায় রেখে তোমার চলে যাওয়া উচিত হয়নি মোটেই। তোমাদের বাড়ীটা যতোধিক স্যাঁৎ, এই সহরটি ততদূর ভয়ঙ্কর স্যাঁৎ। বিকেলের দিকে বেরুবার জো নেই। কী লাল ধুলো! বাতাস বইলেই মেঘ করছে মনে হয়। তারপর যা গরম, তাতে সিদ্ধ হয়ে মরছি। সর্বোপরি তোমার মা-বাবার স্যাঁৎ ব্যবহারে আমার পক্ষে এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যদি শীঘ্র আমাকে এখান থেকে নিয়ে না যাও তাহলে আমি নিজেই কলকাতা চলে যাব—ইত্যাদি।

শ্যামবাজারে বাসা ঠিক করে দাদা বৌদিকে নিয়ে গেল।

এতে জেঠাইমা হলেন যেমন খুসী, জেঠাবাবু পেলেন তেমনি আঘাত। আর আমরা, আমরা মানে—আমি আর আমার জেঠতুতো ভাই বোনেরা—হলাম একটু নিরানন্দ। কারণ বৌদি ছিল আমাদের কাছে বেশ আমাদের বস্তু।

বন্ধুবান্ধব, আমরা ভাবলাম দাদার জীবনটা না জানি কত সুখেই কাটবে! কিন্তু জন্মের আগেই কপালে বিধাতা যা লিখে দেন, তার বেশী নাকি কিছু ঘটে না। বিধাতার অদৃশ্য হস্তে যে লিখন ছিল দাদার ললাটে শেষ পর্যন্ত তা ঘটল।

এই সময় এম-এ পড়ার জন্য আমি কলকাতায় যাই। দাদার বাসায় থাকার চেষ্টা করি; কিন্তু অসুবিধা হবে বলে বৌদি থাকতে দিল না; অগত্যা আমি মেসে উঠি; কিন্তু দাদার ওখানে যাতায়াত আমার নিয়মিতই চলত।

দাদা বৌদির দাম্পত্য-জীবনের বছরখানেক বেশ সুখেই কাটল।

এই সময়ে দাদার একটি মেয়ে হল। তারপরেই দেখা গেল বৌদির দাম্পত্য-জীবনে ভাঁটা এবং ক্রমে সে ভাঁটা হয়ে উঠল তীব্র। ফলে পরবর্তী দু'বছরের দেড়টা বছর বৌদির কাটল বাপের বাড়ীতে, দাদার প্রতি বৌদির টান যতই কমতে লাগল, বৌদির প্রতি দাদায় ভালবাসা ততই গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। দাদা তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বৌদিকে শাড়ী-গহনা প্রভৃতি দিয়ে শেষ করে ফেলল ; কিন্তু তবু তার মন পেল না।

সত্যময় হঠাৎ থেমে আমাকে প্রশ্ন করলো, বল দেখি, কেন এমন হল, এমন সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত, উপার্জনশীল অথচ প্রেমাসক্ত স্বামীকে বৌদির কেন ভালো লাগেনি ?

আমি মুগ্ধ হয়ে একাগ্রচিত্তে কাহিনীটি শুনছিলুম, তাই হঠাৎ এই প্রশ্নের উত্তর আমার মাথায় এলো না। তাছাড়া এরকম অভিজ্ঞতাও আমার নেই ; তাই শুধু বল্লুম, কী করে জানবো, বলো, এ হচ্ছে মন্ত্রী-কন্যার ব্যাপার—

—যা বলেছ, মন্ত্রী-কন্যার যোগ্য ব্যাপারই বটে, কিন্তু এই মন্ত্রী-কন্যার খেয়ালে বেচারা দাদার জীবনটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। যাক ! যা বলছিলাম, দাদা বৌদির মন কেন পেল না। তার কারণ আমি যা ভেবেছি···বৌদি যখনই বাপের বাড়ী চলে যেত, এবং প্রতিবারই প্রায় দাদার অজ্ঞাতে ও অমতে যেত, তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দাদা আমাকে প্রায় সঙ্গে করে নিয়ে যেত। প্রতিবারেই আমি দেখেছি, বৌদি আমাদের কোন কেয়ার না করে নিজের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে নির্জলা ইয়ার্কি দিচ্ছি—যেন গ্ল্যামার গার্ল। তাতেই আমার মনে হয়েছিল বৌদি বিশেষ কোন সামাজিক বন্ধনের, কোন নির্দিষ্ট পুরুষের সহধর্মিনী অন্ততঃ সঙ্গিনীর পদমর্যাদর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় নি। দাদার ঐ বলিষ্ঠ, উন্নত চেহারায় বৌদি ক্ষণিক মুগ্ধ হয়ে

দাদাকে বিয়ে করে ফেলেছিল এবং দাম্পত্য-জীবনের নূতনত্বে কিছুদিন দাদাকে তার ভালোও লেগেছিল। তারপর যেই দেখতে পেল এর এক ঘেয়েমি ভাবটাও নতুন, তখনই তা থেকে মুক্ত হতে চাইল ; ফলে প্রাক্-বিবাহ জীবন-প্রবাহের দিকে তার মন ফিরে গেল—যেখানে ছিল বহু বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে মুক্ত বিহঙ্গের মত বাধাহীন সঙ্গসুখ।...তারপর দাদা যখন অর্থে সর্বশান্ত, মনে দেউলিয়া—ঠিক্ ঐ সময়ে একটা তুচ্ছ ঘটনায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে দাদা-বৌদির এই অপ্রীতিকর দাম্পত্য-জীবনের ঘটল অবসান।

বলে সত্যময় সিগারেটে শেষটান দিয়ে শেষটুকু জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। আমি শুধু ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বিস্ময়ে বল্লুম, ডাইভোর্স...?

—হ্যাঁ, তবে আদালতের আইনের নয়, বৌদি দাদাকে একেবারে ছেড়ে দিল। তাই এমনিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেল—

—এই বিচ্ছেদের তুচ্ছ ঘটনার কথা যা বল্লে, সেটা কী ?—

—হ্যাঁ বলছি,......জেঠাইমার তাগাদায় জেঠাবাবু বৌদি আর খুকুমণিকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতায় যান। বৌদির মেজাজ জানা সত্ত্বেও জেঠাবাবু ভাবলেন খুকুমণিকে পেয়ে বৌদি নিশ্চয়ই বদলেছে।

পরদিন দুপুরে বিশ্রামের সময় জেঠাবাবু বৌদিকে বল্লেন, "বৌমা, দিদিমণিকে কি আমরা দেখতে পাব না? তোমার শাশুড়ী তো দিদিমণিকে নিয়ে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত করে তুলেছেন। তোমাদের পথ চেয়ে তিনি বসে আছেন। সব গোছগাছ করে নাও, কাল সকালে আমরা রওনা হব।"

"না, আমি আর মেদিনীপুরে যাবো না"—

"কেন ?"-

"কী ন্যাষ্টি, ভয়ংকর গরম"—

"কিন্তু তোমার স্বামীর বাড়ী তো"—

"ওরকম স্বামীর বাড়ীতে যেতে চাইনে"—

"কী রকম"—

—"অত্যাচারী—"

"অত্যাচারী? রমেন তো সে রকম ছেলে নয়, কী অত্যাচার করেছে?"

—"অত্যন্ত অসামাজিক আর গোঁড়া রক্ষণশীল। এমন পুরুষের সঙ্গে বাস করা যায় না। আমার দেহটাই ওর সব, এটার উপর ওর যত লোভ, ততো কড়া পাহারা।"

"এসব কি বলছ বৌমা, একথা মুখ দিয়ে বের করতে একটুও লজ্জা করল না।"

"লজ্জা—কিসের লজ্জা, যা সত্যি, তাই বললেম—"

"কিন্তু সে-ত তোমার স্বামী—"

"ও নামটা তো লাইসেন্স-সার্টিফিকেট—"

"এই তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা, এই তোমাদের আধুনিকতা, এই কী নারী প্রগতি, এরই নাম নারীর সমান অধিকার ......" বলে জেঠাবাবু তৎক্ষণাৎ দাদার বাসা ত্যাগ করলেন। সম্ভবতঃ জেঠাবাবু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন।

—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না—হঠাৎ আমি বলে ফেল্লুম।

—কী কথা—

—কোনও শিক্ষিতা তরুণী তার শ্বশুরকে মুখোমুখি আর যাই বলুক এ কথাগুলো বলতে পারে না।

—ওঃ, এই বিশ্বাস! বলে হঠাৎ সত্যময় হো হো করে হেসে উঠলো, কলেজ ছেড়েই তো এখানে ঢুকেছ, কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা,

৫

এটা আমার প্রাক্‌টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। ভায়া হে, সত্যময় বিশ্বাসের কথা অবিশ্বাস করো না।

—তা হলেও মনে হয়, কিছু অতিরঞ্জন রয়েছে—

—কথাগুলো জেঠাইমার মুখ থেকে শুনেছি ; কিন্তু শেষটুকু শুনলেই বুঝতে পারবে এটা অতিরঞ্জন না অতি সত্য—বলে সে বলা সুরু করল।

জেঠাবাবু কলকাতায় এসেছেন শুনে ঐদিন সন্ধ্যার দিকে আমি দাদার বাসায় গেলাম, গিয়ে দেখলাম তা বলা যায় না, চারিদিকে একটা বিরাট হাহাকার, শুধু শূন্যতা। জেঠাবাবু, বৌদি, খুকু—কাউকে দেখতে পেলাম না। জিনিষপত্র এদিক-ওদিক ছড়ানো, ট্রাঙ্কগুলো খোলা, চতুর্দিকে একটা ছন্নছাড়া অবস্থা, শুধু শোয়ার ঘরে বিছানার ওপর দাদাকে বসে থাকতে দেখতে পেলাম। দুদিন আগে যে দাদাকে দেখেছিলাম এখন সে নয়। পিতার জরাকে দেহে ধারণ করে যুবক পুরুষরা যেমন একদিনেই জরা বনে গিয়াছিলেন, তেমনি দাদার বয়েস যেন দুদিনেই দশ বছর বেড়ে গেছে। মুখ রক্তহীন—একেবারে ফ্যাকাসে, চোখ-গাল বসে গেছে। ধীরে ধীরে দাদার পাশে গিয়ে বসলাম। সাংঘাতিক কোন একটা যে বিপদ ঘটেছে বুঝতে পেরে দাদাকে কোন কথা বলতে আমার সাহস হল না। দাদা ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ পকেট থেকে বের করে আমাকে দিল—কিন্তু কোন কথা বল্লো না। তাতে লেখা ছিল :

প্রিয় রমেন,

তোমার বাবা আমাকে মেদিনীপুরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি যুক্তি দেখিয়ে যেতে অস্বীকার করায় তিনি এখান থেকে চলে যান। অনেক দিন ধরে ভেবেচিন্তে দেখলাম তোমার সঙ্গে আমার জীবন যাপন করা অসম্ভব। আমিও আজ চল্লেম। দু'টো ভূয়ো সংস্কৃত বুলির সাহায্যে বিয়ের নামে পুরুষরা নারীদেহ রেজেষ্ট্রী করে নিজের

ভোগ-দখল কায়েম করে যথেচ্ছ ছিনি-মিনি খেলে। আমি এর ব্যতিক্রম—এর পরিবর্তন আনতে চাই। তিন বছর ধরে এই বন্ধনের দ্বন্দ্ব আমার মর্মকে অহর্নিশ দগ্ধ করেছে, সেই বন্ধনকে আজ আমি মুক্ত করলেম। বালীগঞ্জে চল্লেম। বার বার তুমি আমাকে বালীগঞ্জ থেকে ধরে এনেছো। গেলবারের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। আবার বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে যে কেলেঙ্কারী করেছো, তাতে আমার মাথা কাটা গেছে। তার পুনরাভিনয় যেন না ঘটে—এই আমার শেষ আদেশ। আমাকে পাবার লোভ ত্যাগ করো। খুকুকে নিয়ে গেলাম। তুমি ক্ষণিকের জন্য যে 'প্যাসন' চরিতার্থ করেছো, আমাকে তার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে বহুদিন ধরেই—আমার জিনিষপত্র নিয়ে গেলেম। ইতি। রুবি রায়

বার তিনেক চিঠিটা পড়ে পকেটে রাখলাম।

দাদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, বালীগঞ্জে যাই, চল শেষ চেষ্টা করা যাক্! দাদা শুধু বলল, না।

বুঝলাম এতোদিনে দাদা তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

ঘরে তালাবন্ধ করে দাদাকে নিয়ে আমার মেসে আসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

মহানগরীর রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত—চতুর্দিক ঝলমল করছে। এই রহস্যময়ী পুরীর মায়াপথে কত নবীন যুগল দম্পতি, কত তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা গুঞ্জন করতে করতে চলেছে—পাশের চলমান জনস্রোতের দিকে নেই তাদের এতটুকু ভ্রূক্ষেপ—এই রহস্যময়ী পুরীতে যেন তারা শুধু দুজন-দুজনা—একটি নর, একটি নারী। দাদা কি ভাবছিল জানি না; আমি তখন শুধু ভাবছিলাম এদের এই প্রগাঢ় প্রেমের মধ্যে যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি রয়েছে, এখন চোখে তা পড়েনি, পড়বেও না, কিন্তু যেদিন পড়বে······

"স্যার, এই অঙ্কটা বুঝতে পারিনি—"

দেখি, সত্যময়ের অনুগত সুবোধ ছাত্র গোপাল বীজগণিত ও খাতা হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনি অকুস্থলে ছন্দপতনে এই বেরসিক ছাত্রকে প্রবল চপেটাঘাতে একটা নীতিগর্ভ উপদেশ শিক্ষা দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল; কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হবার পূর্বেই সত্যময় তাকে বললো, যা, আমি যাচ্ছি। গোপাল চলে যেতেই ঘটনার পরিণতি জানার আগ্রহে আমি বন্ধুবরকে জিজ্ঞেস করলুম, তারপর…

তারপর, আর কিছুই নেই, দাদা এখন আবার বিয়ে করতে চায়, সেই উদ্দেশ্যে ভবানীকে দেখতে এসেছিল। এবারে কিন্তু সচিব সখীমিথ প্রিয়া শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ মেয়ে চায় না, শুধু চায় নিতান্ত একটি সাধারণ মেয়ে—গ্রাম্য মেয়ে—যার থাকবে না বিশ্ববিত্যালয়ের ডিগ্রী, আধুনিকতার ছাপ, পুরুষ বন্ধু-বান্ধব। দেখনা, এরকম একটি মেয়ে বলে সত্যময় উঠে পড়ল। আর আমি থ' হয়ে বসে কেবল ভাবতে লাগলুম……

শ্রাবণ, ১৩৫৮।

আমরা যে কয়জন স্নাতকোত্তর বিদ্যার্থী সান্ধ্য-বিদ্যালয় 'বিদ্যার্থী ভবনে' পড়তাম, তার মধ্যে ছায়াই ছিল মেয়েদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা··· অর্থাৎ এখনো সে উত্তর পঁচিশে পৌছয় নি, এখনো চঞ্চল যৌবন তার দেহ ছেড়ে সরে পড়েনি। কাজে কাজেই তার যৌবনের তপ্ত পরশ প্রত্যাশায় আমাদেরই কয়েকজন যে তার তরুলতার চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে, এ প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধ হলেও আমি কিন্তু ততটা তা বিশ্বাস করতাম না। কারণ, আমরা যারা এখানের বিদ্যার্থী, তারা সবাই কেউ বা সরকারী কিংবা সদাগরী অফিসের কেরাণী, কেউ বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক; সুতরাং কলেজীয় রোমান্টিক প্রেম করার মত বয়স, অন্ততঃ মানসিক অবস্থাটা আমরা কাটিয়ে ফেলেছি। পিতৃ-অর্থে বাস করে বান্ধবী বা সহাধ্যায়িনীর সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে একটা মোলায়েম বিজিগীষা থাকতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করে দশটা-পাঁচটার পর রাত্রি ন'টা পর্যন্ত কলেজে পড়া-শোনা করায় এহেন রোমান্টিক প্রেম করার মতো অবস্থা হৃদয় থেকে আপসেই উঠে যায়। তথাপি এর পরেও যে প্রেম করা চলে, একথা সুকান্ত সেদিন আমাকে শোনাল,···একটা জিনিষ লক্ষ্য করছ; ছায়াকে নিয়ে একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

আমি ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকি।

ছায়াকে নিয়ে একটা 'গোষ্ঠী' গড়ে উঠছে! আমি একটু বিস্মিত হলাম; কারণ, ওর কথাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি; তাই বললাম, মানে?

মানে শীতাংশু, হরেকৃষ্ণ, বেচুলাল, কালাচাঁদ আর কবি শ্বেতকেতু ওকে নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে।

এ কথায় আমার মনটি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। তাই বললাম,···সে কী রকম?

বই দেওয়া-নেওয়ার ছলে ওরা ছায়ার বাড়ীতে আড্ডা জমাতে সুরু করেছে।

মনটা যেমন গরম হয়ে উঠছিল, তেমনি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কারণ, এর মধ্যে আর এমন কী থাকতে পারে। তাই বললাম, দেখ, প্রত্যেকের তো সব বই থাকতে পারে না, পরস্পর দেওয়া-নেওয়া তো করবেই।

তা না-হয় করল; কিন্তু ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খাওয়া বা সিনেমা দেখা; এর কী অর্থ হয়?

এক-আধদিন ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয়-খাওয়া বা সিনেমা-দেখার মধ্যে যে কী থাকতে পারে, তাও বুঝলাম না। তাই একটু উষ্ণ হয়ে বললাম, এরও কোনো অর্থ নেই, এতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, তা আমিও জানি; কিন্তু ক্লাসে আরো তো মেয়ে রয়েছে; তাদের নিয়ে তো ওরা রেস্তোরাঁয়ও খায় না, সিনেমাও দেখে না।

এসব বাজে কথা নিয়ে কখনো ভাবিনি, আর এখন তা ভাববার অবস্থাও আমার নেই; তাই বললাম, রাত্রি অনেক হয়েছে, এখন চলি, ঐ যে আমার ট্রাম এসে গেছে। বলেই ছুটে গিয়ে ট্রামে উঠলাম।

ট্রামে বসতেই সুকান্তর কথাটা কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে তুলল, বিশেষ করে ওর তাদের নামকরণটি—'ছায়া-গোষ্ঠী'। সুকান্তের মধ্যে যে এক শিল্পী মন বাস করছে, তা আগেই জানতে পেরেছিলাম; কিন্তু এখন তার এই নামকরণের মধ্যে তার পুরো পরিচয় পেলাম।

বিশেষ একজন নারীর নামে 'গোষ্ঠী' গড়ে ওঠার যে ইতিহাস, সে তো মানব-সভ্যতার গোড়াকার কথা। সেই মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে সেদিন নরের ছিল না কোন স্থান। তারপর কালক্রমে ঘুরে গেল ইতিহাসের চাকা। এলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং তা এখনো বহাল তবিয়তেই আছে। আবার কী ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন হল নাকি! মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ কী আবার গড়ে উঠবে! কী জানি। কিন্তু সুকান্ত কী এতো কথা ভেবে ছায়ার নামে এই দলের নাম দিয়েছে 'ছায়াগোষ্ঠী' না শুধু নিছক কৌতুক ক'রে? মনে হল, শেষেরটাই সত্যি।

আর এই নিয়ে আমার মনেও একটা অহেতুক কৌতূহল জন্ম নিল।

ওদের মধ্যে কবি শ্বেতকেতুর সঙ্গে আমার একটু ভাব আছে। তার কারণ, আমার গল্প। আমার গল্প নাকি ওর খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে সদ্যপ্রকাশিত 'প্রেম' নামক নিছক রোমান্সের গল্পটি ওর খুব ভাল লেগেছে।

ওদের ভিতরের কথাটা জানার জন্যে একদিন কথায় কথায় ঐ গল্পের প্রসঙ্গটা তুললাম,—তুমি তো বলো, ও-রকম প্লেটোনিক প্রেমের গল্প তুমি নাকি পড়নি। জান, ওটা সত্য আর ঘটেছিল আমারই জীবনে—

শ্বেতকেতু একরকম প্রায় লাফিয়েই উঠল,—তাই নাকি! তাই তো এতো জীবন্ত হয়েছে। ভাল করে শুনতে চাই। চলো একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি,—বলেই ও আমাকে সামনের রেস্তোরাঁয় নিয়ে উঠল।

বুঝলাম, ওষুধ ধরেছে। তাই মূল গল্পটির সঙ্গে কিছু যোগ-বিয়োগ করে এক অপূর্ব্ব রোমান্সের গল্প ফেঁদে বসলাম এবং লক্ষ্য করলাম, ও তন্ময় হয়ে শুনছে। তাই এক চরম মুহূর্তে ওকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম,—' কবি, তুমি কী কখনো প্রেমে পড়েছো—

অকস্মাৎ এই প্রশ্নের জন্য শ্বেতকেতু প্রস্তুত ছিল না। ও একটু চমকে উঠলো। আর ঠিক এমনি অবস্থায় নতুন প্রেমে-পড়া তরুণরা যা করে, ও-ও তাই করল অর্থাৎ ও নিজের প্রেমের কাহিনী বলা সুরু করল।

যদিও প্রণয়িনীর নামটি বলল না; কিন্তু শোনা-শেষে বুঝতে পারলাম, মেয়েটি আসলে ছায়া। আর সেজন্য আমিও পীড়াপীড়ি করলাম না।

ক্রমে ক্রমে ও আমাকে এক রকম সবই জানাল। কথায় কথায় একদিন প্রেম-পাগলের মতো ও আমাকে বলে বসল,—ছায়াকে না-পেলে আমি মরে যাব।

আমি রহস্য করে বললাম,—তাই নাকি! বেশ, কবে মরছো, জানিও। আর তুমি না জানালেও সংবাদপত্রের মারফত এমন খবরটা অন্ততঃ জানতে পারবো। কিন্তু মনে মনে বললাম, বেচারী! তুমি তো অনেক আগেই মরে গেছো। এখন বিধাতা যদি দয়া করে তোমাকে এ-যাত্রা বাঁচান, সেই তোমার মঙ্গল।

—ওঃ! ঠাট্টা করছো, শুনলে বুঝতে পারবে এটা ঠাট্টা নয়। ছায়া লিখেছে—

—ছায়া লিখেছে!—আমি অবাক হলাম,…তোমাকে না-পেলে সে-ও কী মরে যাবে না কি!

শ্বেতকেতু একটু হেসে উঠল, বলল,—সে লিখেছে, তার বাড়ীতে আমাদের যারা যায়, তাদের সে পছন্দ করতে পারে না।

আমি একটু কৌতুক করে বললাম, শুধু তুমি ছাড়া,—তারপর একটু থেমে চিন্তিত মনে বললাম, যে যে যায় তাদের নাম দিয়েছে কী?

—হ্যাঁ।

আমার নাম দিয়েছে না কি!

আমার শঙ্কা লক্ষ্য করে ও হেসে বলল,⋯না, তোমার নাম দেয়নি, তুমি তো কখনো যাওনি...

⋯কে কে যায় ?

⋯শীতাংশু, বেচুলাল, হরেকৃষ্ণ, কালাচাঁদ—এরা সবাই।

এতদিন পরে সুকান্তর! 'ছায়াগোষ্ঠি' নামকরণটা আমার কাছে নির্মল আকাশের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তা যে সার্থক হয়েছে বুঝলাম।

কিন্তু আমার ধারণা ছিল, কবি একাই তার প্রেমে পড়েছে। আজকে সে ধারণা বদলে গেল। একটু-আধটু ওরা সবাই যে ছায়ার প্রেমে পড়েছে তা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু একমাত্র বয়স ছাড়া যে ছায়ার রূপের মধ্যে কী আছে, তা তো এতদিনেও আমার চোখে পড়ল না।

ছায়াকে দেখতে তা যেন জ্যামিতির পাঁচ-ফুট এক-ইঞ্চির একটি সূক্ষ্ম সরল-রেখা। মুখটিও তার ঠিক 'চাঁদ-মুখ' নয়--কী গোলত্বে, কী ঔজ্জ্বল্যে ; বরং গোলত্বে কতকটা হাঁসের ডিমের মতো ; আর ঔজ্জ্বল্যে, ভদ্রভাষায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছু বলা যায় না। আসলে যা চোখে পড়ে, সে তার চোখ দুটি—যেন অজন্তা-চিত্রের সেই ঢুলু ঢুলু আঁখি⋯আধো বোঁজা, আধো খোলা।

কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, বোঝা গেল না। 'ছায়া-শ্বেতকেতু' কাহিনী আমাদের কেউ কেউ জানতে পারল। যে ছেলেরা তা শুনল, তারা মুখ খুলে হাসল এবং কৌতুকবশে শ্বেতকেতুকে দু'একটা টিপ্পনী কাটল। আর মেয়েরা যারা শুনল, তারা শুধু মুখ টিপে হাসল, আর অন্তরে ঈর্ষার একটা অপ্রকাশ্য জ্বালাও যে অনুভব না-করল, তা নয়। কিন্তু এ-জীবনে আর

সেদিন ফিরবে না জেনে অতীত জীবনের হারিয়ে-যাওয়া হয়তো কোনো স্বপ্ন-মধুর সুখ-স্মৃতির রোমন্থন করে শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে শ্বেতকেতু দায়ী করল আমাকে। আমি যে তার বিশ্বাস ভাঙিনি, এবং প্রেম যে কখনো চাপা থাকে না, আমার এ কথা দু'টো সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। আর তাই সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বে ঢিলা দিল।

আমার উপর শ্বেতকেতুর এই মনোভাবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আর উপায় নেই। কারণ, পরীক্ষা সামনে।

পরীক্ষা হয়ে গেল এবং যথাসময়ে তার ফলও বেরিয়ে গেল। ফল দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। 'ছায়াগোষ্ঠীর অনেকেই কাৎ হয়ে গেছে। কাৎ যে তাদের দু'একজন হবে, আগে থেকেই সে-ধারণা আমার ছিল; কিন্তু বেচুলালও যে ফেল করবে, এটা আমি কেন, আমরা কেউই ভাবিনি। আর কবি বেচারীও যে থার্ডক্লাস পাবে, এটাও আমাদের আশার বাইরে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ওদের পাশ-করিয়েদের মধ্যে একমাত্র ছায়াই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে, বাকী সবাই থার্ড ক্লাস! ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় ঠেকল। কিন্তু এ রহস্য ভেদ আমার সহজ সাধ্য নয়।

পরীক্ষার পর ওদের কারো সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তাছাড়া, ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সম্পর্ক তেমন ছিল না বলে, ঠিকানা যোগাড় করে এ-রহস্য ভেদের চেষ্টাও করলাম না।

কিন্তু আশ্চর্যে আকাশ ভেঙ্গে পড়লাম মাস দুই পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেট দেখে।

ছায়া! হ্যাঁ, আমাদের ছায়া, ছায়া চক্রবর্তী পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। ধাঁধা-লাগার মতো মনে হল, যেন ভুল দেখছি। তাই চশমাটা খুলে চোখ মুছে আবার দেখলাম। না, ছায়া চক্রবর্তী নামে আর দ্বিতীয় নাম নেই; বরং মায়া চক্রবর্তী নামে একটি নাম দেখলাম।

মনটা কিন্তু এবারে আমার বেশ খারাপ হয়ে গেল। নিজের আশা ছিল এবং অধ্যাপকদের ধারণা ছিল, আমাদের মধ্যে আমিই ভালো করবো। কিন্তু ছায়ার থেকে আরও কয়েকজনের নীচে আমার নাম! এ কী করে হোলো! বারেকের জন্য আমিও মুষড়ে পড়লাম; কিন্তু পরক্ষণে মনে হল নিশ্চয় এর মধ্যে সেই রহস্য রয়েছে। কিন্তু কী করে এই রহস্য ভেদ করা যায়।

মনের মধ্যে এই নিয়ে যখন দিন কাটাচ্ছি, এমন সময়ে একদিন আকস্মিক ভাবে বেচুলালের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

ভবানীপুরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ট্রামে বাসায় ফিরছি; দেখি, লাভার্স লেন দিয়ে বেচুলাল তার সেই বিশেষ চলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে ট্রাম লাইনের দিকে আসছে। আমি টপ্ করে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম।

দেখলাম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের পাশ দিয়ে সূর্যদেব দিগন্ত-রেখায় সমাসীন; আর তার আরক্তিম করুণ আভায় পশ্চিম আকাশ যেন বেদনায় পাণ্ডুর। লাভার্স লেনের ঘন সারিবদ্ধ গাছগুলি যেন সেই বেদনাকে আড়ালে রাখতে যত্নবান। সেইদিকে একবার তাকিয়ে বেচুলালকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম।

দেখলাম, বেচুর মুখটা বেশ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়ে তা যেন আরো একটু শুকিয়ে গেল! কাছে পৌছতে জিজ্ঞেস করলাম,—এদিকে কোথায় গেছলে?

—এখানটা নির্জন বলে ছুটির পর এখানে একটু বেড়াতে আসি—

বুঝলাম, বেচুর মনটা বেশ ভেঙ্গে গেছে; তাই গড়ের মাঠের এই নির্জন অংশে কিছুক্ষণ একা একা থাকতে চায়।

ও আমাকে জিজ্ঞেস করল,—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ওকে দেখেই যে ট্রাম থেকে নেমেছি, তা জানালাম। তারপর বললাম,—তোমাদের খবর কী?

ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন একটু ভাবল, তারপর বলল,—তোমাদের মানে—

—মানে, শ্বেতকেতু তোমার—

—আমার! সে তো জানো—

—তা তো জানি, কিন্তু……কিন্তু তুমি ফেল করলে কী করে?

এ-প্রশ্নে ওর মুখটা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝলাম এ প্রসঙ্গটা ও এড়াতে চায়। আমি আমার গন্তব্যস্থান বললাম।

শুনে ও বলল,—তবে এই ট্রামে ওঠ,—বলে ডালহৌসীগামী একটা ট্রামে উঠে পড়ল। আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

এসপ্ল্যানেডে ওকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় উঠলাম। বরফ দেওয়া লাসি খেতে খেতে এক সময় কথার ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার সে অনেক কথা কী বলো দেখি শুনি—

কী যেন ভেবে নিয়ে ও বললো,—ভেবেছিলাম কাউকে বলবো না… কিন্তু তোমাকে বলছি। তোমাকে বলা উচিত, তুমি গল্প লেখক। নারী চরিত্র যে কত জটিল আর রহস্যময় তার একটা জ্যান্ত দৃষ্টান্ত অন্ততঃ তোমার ষ্টকে থাকুক।

বলে ও বলা সুরু করল,—ছায়ার সঙ্গে আমাদের—আমাদের মানে কবি শ্বেতকেতু, কালাচাঁদ, শীতাংশু, হরেকৃষ্ণ আর আমার বই দেওয়া নেওয়া হত, তা তুমি, বোধহয় জানতে।

আমি বললাম,—একটু আধটু জানতাম। কারণ, তোমাকে একবার একটা বই তিন-চার বার চেয়েছিলাম, তুমি প্রতিবারেই বলেছিলে বইটা নাকি ছায়ার কাছে আছে।

—সত্যি ছিল, শুধু একটা নয়, বহু বই ছিল এবং এখনো দু'চারটা রয়ে গেছে। সে যাক, আসল ব্যাপারটা শোনো, সংক্ষেপেই বলছি…।

—পরীক্ষার যে-হলে আমার সীট পড়েছিল, সে হলে শ্বেতকেতু ও শীতাংশুর সীট পড়েছিল, আর কয়েকজন মেয়েরও। আমাদের কপাল-গুণে ছায়ারও সীট ঐ-হলে পড়েছিল।

—যেদিন সীট য়্যারেঞ্জমেণ্ট লিষ্ট বেরুল, সেইদিন সন্ধ্যায় ছায়া আমার পকেটে ভাঁজকরা একটা কাগজ ফেলে দিয়ে 'বলল ঘরে গিয়ে পড়ো'……

—পড়ে দেখলাম, সে এক অপূর্ব্ব 'মেঘদূত'……এক লম্বা চিঠি। ঠিক চিঠি নয়, প্রেমপত্র বলাই ভালো, ইনিয়ে-বিনিয়ে সে যা লিখেছে, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, সে আমাকে ভালবাসে এবং এই ভালোবাসাকে স্থায়ী করতে চায় পরীক্ষার পর আমাকে বিয়ে করে।…

—য়্যাঁ! বলো কী!…আমি আঁৎকে উঠলাম।

ও আমাকে থামিয়ে বললো, এখন চমকে উঠছ কেন। শেষটা শোন, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন লিখেছে। অবশ্য তখন তা বুঝতে পারিনি। শুধু আমি কেন; কবি, শীতাংশু আমরা কেউ তা বুঝতে পারিনি…

—কবি, শীতাংশু বুঝতে পারেনি! …আমার বিস্ময় ভয়ানক বেড়ে গেল। মানে!

—সেইটাই তো আসল। বলছি বলে বেচুলাল বলতে আরম্ভ করল;…চিঠির শেষটায় জানিয়েছে, তার প্রথম দুটি পেপারের প্রিপারেশন ভালো হয়নি। আমি যেন ঐ দু'টো পেপারের ফাষ্ট হাফের উত্তর-

খাতায় তার রোল-নম্বর দিয়ে দিই ; আর তা' না হলে সে নিশ্চয়ই ফেল করবে। অবশ্যই সে-ও তার ঐ ঐ পেপারে আমার রোল-নম্বর বসিয়ে দেবে। তাতে হয়তো আমার কিছু নম্বর কমে যাবে। কিন্তু আমি পাশ করলে, আর সে ফেল করলে আমাদের যে নীড় বাঁধা হবে না। সুতরাং এ আমাকে করতেই হবে।

তোমাকে এখন আর বলতে লজ্জা নেই, ওর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল। আর তাই পরীক্ষার খাতায় আমি ওর রোল-নম্বরই দিয়েছিলাম।

সত্যি!—আমি অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ! আর জানো, ঐ দুটো পেপারই আমার স্ক্র্যাচড্ হয়ে যায়।

ভয়ানক বিস্মিত হলাম ; কিন্তু লক্ষ্য করলাম, শেষ কথাগুলো বলতে ওর মুখটা কেমন করুণ হয়ে উঠল।

দু'টো পেপারই স্ক্র্যাচড্ হলো কেন জানতে চাইলে ও বলল,—ছায়ার খাতা দু'টির একটিতে তিন আর অন্যটিতে চার নম্বর পেয়েছি। আসলে ছায়া খাতাগুলোয় ইচ্ছে করে কিছু লিখেনি। চারঘণ্টা ধরে বাকী হাফ পেপারগুলো লিখেছিল।

অকস্মাৎ আমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে গেল। বেচুর জন্য মনটা ব্যথায় ভরে উঠল।

কবি থার্ডক্লাস পেল কেন আর শীতাংশু ফেল করল কেন জিজ্ঞেস করতে ও বলল,—ওদের ক্ষেত্রেও ঐ একই। ওদেরকেও ঠিক এই রকম চিঠি কবির ক্ষেত্রে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পত্রের ও শীতাংশুর ভাগ্যে ষষ্ঠ পত্রের প্রথম অর্দ্ধেক পত্রগুলি ভার পড়েছিল। ফলে শীতাংশুর ঐ পেপারটা স্ক্র্যাচড্ হয়ে যায় ; অবশ্য কবির হয়েছিল একটা। বাকী দু'টোর সেকেণ্ড হাফগুলিতে পঁচিশের বেশী করে ছিল।—বলে বেচু থামল।

মোহগ্রস্তের মতো এই অপূর্ব কাহিনী শুনছিলাম, তাই সহসা কোনো কথা আমি বলতে পারলাম না ; কিন্তু বেচুলালের দীর্ঘনিশ্বাস আমার কানে আসতেই আমার মোহ কেটে গেল। আমি বললাম, দুঃখ করে আর কী করবে, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এবছর আবার পরীক্ষা দাও।

—দেব, সে রকম হচ্ছেও আছে। না, আর নয়, এবার ওঠ,—বলে বেচু উঠবার চেষ্টা করল।

ওকে আর একটু বসতে বলে ছায়ার কথা জানতে চাইলাম, তোমাদের কথা তো শুনলাম, ছায়ার কথা তো কিছু বল্লে না। তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি ?

—হয়েছিল একবার ; তার বিয়ের পরে—

—তার বিয়ের পরে !—আমি বিস্ময়ে বেচুর মুখের দিকে তাকালাম।

—শোননি ! পরীক্ষার পরেই তো ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

—কার সঙ্গে ! কবির সঙ্গে ?···

ও একটু হেসে উঠল। তারপর বলল,···এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গল্প লেখ। না, কবির সঙ্গে নয়, এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের সঙ্গে।

—য়্যাঁ !!···মনে হল রেস্তোরাঁর ছাদটা আমার সামনে ধ্বসে পড়ে গেল,—বলো কী !···

—ওসব মেয়েরা সবই পারে। জানে, কবির সংসার মানে অনশন। শাড়ী-গাড়ীর মধ্যে জীবন কাটাতে হলে পুলিশ-অফিসারের যোগ্যতা স্বামী হিসাবে যে যোগ্যতম, তা ছায়া বেশ বোঝে। না, আর না, ওঠ ···বলে ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শিয়ালদার বাসে উঠে বেচু চলে যেতে চৌরঙ্গীর চতুরঙ্গ-বর্ত্ম অতিক্রম করে পৌছলাম এ্যাসপ্ল্যানেড-চক্রে। রাত্রির এই মহানগরীর মর্মস্থল বিচিত্রবর্ণের আলোতে উদ্ভাসিত, সে যেন রাত্রির রং করা রূপসী

বারঙ্গণা ; বিচিত্র বর্ণের পোষাকে অপরূপ রূপসজ্জায় পথিকের ক্ষুধিত দৃষ্টি বিভ্রান্তকারিণী। তার এই যৌবন-উচ্ছল রূপের তরঙ্গ দেখে মনে হয় না যে তার বুক ইঁট-পাথর দিয়ে গড়া ; তা কঠিন, তা ভয়ানক কঠিন !

হাওড়া-গামী ট্রামটা পৌছুতে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। ট্রামে উঠে অন্ধকার দূর আকাশের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম…'ছায়াগোষ্ঠীর' কথা। ভাবলাম, ওদের নির্বুদ্ধিতার কথা ·· একটি মেয়ের ভালোবাসার কথায় ওরা এমন বোকার মতো কাজ করল, যার প্রায়শ্চিত্ত ওরা সারা জীবন ধরে করে যাবে……

ভাবলাম, এ ভুল শুধু এদের নয়, এ ভুল পৃথিবীতে প্রথমও নয় ; এ ভুল পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের। সেদিন তাঁর একক নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী প্রিয়-বান্ধবী ইভের সোহাগ-ভরা কথায় জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে যে-ভুল তিনি করেছিলেন, যুগ যুগ ধরে তাঁর সন্তানরা সেই ভুল শুধু করে আসছে এবং করবেও ; কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে তাঁর যে জ্ঞানোদয় হয়েছিল, তাঁর সন্তানদের শুধু তা আর হোলো না……

ফাল্গুন, ১৩৫৯।

প্রেম পথহীন

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অকস্মাৎ একদিন রটে গেল,—স্বস্তিকাকে পাওয়া যাচ্ছে না—স্বস্তিকা নিখোঁজ। ছেলেদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেল, বিশেষ করে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে।

স্বস্তিকা প্রিন্সিপ্যালের কনিষ্ঠা কন্যা, কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। সৌন্দর্যে আর সৌষ্ঠবে তার তনুলতা অন্য সহপাঠিনীদের চাইতে বহুলাংশে চোখ-ঝলসানো। ফলে প্রথম থেকেই তার অনেক সহাধ্যায়ীর চোখ তার দিকে পড়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল-নন্দিনারূপে তার সঙ্গে মিশবার সুযোগ সহজতর হওয়ায় তার সহাধ্যায়ী অনেকেই সে সুযোগ গ্রহণ করল এবং তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কেউ কেউ তার প্রেমে পড়ে গেল।

স্বস্তিকার সঙ্গে দহরম সবচেয়ে বেড়ে গেল পাঞ্জাবী-ছাত্র কুলবন্তর। কুলবন্ত প্রথম বছরেই কলেজের বার্ষিক খেলা-ধূলায় চ্যাম্পিয়ান হল। এই সূত্রেই স্বস্তিকার সঙ্গে হল তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। তাই স্বস্তিকার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কুলবন্তের ক্লাসে অনুপস্থিতি সকলের চোখে বড় হয়ে দেখা দিল। ফলে সকলে নিজেদের বয়সোচিত দৃষ্টিকোণ থেকে একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হল। আর তাদের এই অনুমিত সিদ্ধান্ত সত্যরূপে প্রকাশ পেল সপ্তাহ খানেক পরে একদিন—যেদিন তারা স্বস্তিকাকে ও কুবলন্তকে একই সঙ্গে ক্লাসে উপস্থিত দেখতে পেল; আর শুনল স্বস্তিকা কুবলন্তকে তাদের রাঁচির বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল।

এরপর আর যায় কোথায়! মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল! তাই এই সামান্য বেড়ানোটা তাদের কাছে রূপায়িত হয়ে উঠল অসামান্যরূপে।

সুতরাং রচিত হল রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী রোমাণ্টিক কবিতা আর প্রেমের গল্প। আর এগুলি সংগৃহীত হয়ে একটি গোপন হস্তলিখিত পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করল।

কিন্তু রণধীর এ ব্যাপারে কিছুই করল না। অথচ সেই শুধু ক্লাসের নয়, কলেজের সেরা লিখিয়ে। গল্পে-প্রবন্ধে ইতিমধ্যে সে কলেজের কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়ে গেছে। সুতরাং এহেন রণধীর এহেন ব্যাপারে না দিল একটা সরল গল্প, না দিল একটা মুখরোচক প্রবন্ধ। পত্রিকা পরিচালকদের কোনো অনুনয় সে রক্ষা করল না।

এর কারণটি অবশ্য গভীরতর। সে বেচারা সত্যই ভালবেসে ফেলেছে স্বস্তিকাকে। যাকে সে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে, তাকে সে বাইরে হেয় করতে পারল না। যদিও স্বস্তিকার এই ব্যাপারে সে-ই পেয়েছে সবচেয়ে গভীর আঘাত। সে মনে মনে একটা রোমাণ্টিক মোলায়েম গর্ব পোষণ করত; যেহেতু সে ক্লাসের সেরা ছাত্র আর কলেজের সেরা লিখিয়ে, সেহেতু তার প্রতি তার সহাধ্যায়িনীদের একটা হৃদায়ক দুর্বলতা থাকবে এবং স্বস্তিকার নিশ্চয়ই তাই আছে। সুতরাং এই ব্যাপারে তার সে-অহঙ্কারে লাগল ঘা আর সেইজন্যে বেচারী গেছে একেবারে মুষড়ে।

তবুও এরপর সে অনেক ভেবেছে, বহুদিন নদীর ধারে নির্জনে একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর ভাবে ভেবেছে—কথাটা সে স্বস্তিকাকে বলবে—অন্ততঃ আকারে-ইঙ্গিতে। কিন্তু যথা সময়ে কিছু করতে পারত না, বরং স্বস্তিকাকে খুব কাছাকাছি হতে দেখলে তার বুকের স্পন্দন বেড়ে যেত ঃ এমন কি তার চোখে চোখ রেখে একটা দিনও সে কোন কথা কইতে পারে না। তার চেহারাটা যেমন মেয়েলি, চরিত্রটি তেমনি নারীসুলভ ঃ সে যেমনি নম্র, তেমনি লাজুক। তাই তার হৃদয়ের কথাটি কোনরূপেই সে আর স্বস্তিকাকে জানাতে পারে না।

কিন্তু এক অদম্য শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে আই-এ পরীক্ষার পর একদিন সে মরিয়া হয়ে স্বস্তিকাকে প্রেম নিবেদন করে বসল—একেবারে স্বস্তিকার পড়ার ঘরে।

—য়্যাঁ!—স্বস্তিকা মনে মনে আঁৎকে উঠল। সে ভাবল, এই ভাল ছেলেটার পেটে পেটে এতো! কতকটা ধমকানির ভঙ্গীতে, কতকটা কৌতুক করার জন্যে সে বলে উঠল,—তাই নাকি! বেশ, তাহলে কথাটা বাবাকে জানিয়ে 'পাকাপাকি' করে নিতে হয়—

ব্যস! আর দেখতে হোল না। রণধীরের গায়ের গেঞ্জীটা ভিজে গেল আর কপালের পাউডার চুঁইয়ে ঘাম বেরুল। কোনোরকমে গেটের বাইরে গিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ রকম উত্তর সে মোটেই আশা করেনি।

আলোকপ্রাপ্তা প্রথম শ্রেণীর আধুনিকাদের মধ্যে সাধারণতঃ বিধর্মী বা বিজাতীয় পুরুষকে পতিত্বে বরণে যে রোমান্টিক অনুপ্রেরণা কাজ করে, সেই অনুপ্রেণায় সম্ভবতঃ স্বস্তিকা কুলবন্তকে ভালবেসেছিল এবং ভবিষ্যতে তাকে স্বামীত্বে বরণ করার বাসনাও যে তার ছিল না, এমনও নয়।

কিন্তু আই-এ পরীক্ষায় মারাত্মক ঘায়েল হয়ে কুলবন্ত কলেজ ও পড়া দুই-ই একসঙ্গে ছেড়ে দিল।

এই মফঃস্বল কলেজে ইংরাজীতে অনার্স পড়ানর ব্যবস্থা না থাকায় রণধীর কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে চলে গেল! আর স্বস্তিকা ইতিহাসে অনার্স নিয়ে এই কলেজেই রয়ে গেল।

কুলবন্তর ফেল হওয়ায় কুলবন্তর চেয়ে স্বস্তিকা যেন বেশী আঘাত পেল। এবং মুষড়ে গেল যেন তার চাইতে অনেক বেশী। উৎসাহ দিয়ে স্বস্তিকা তাকে আবার পড়বার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু বাস্তববাদী পাঞ্জাবী ছেলে তার উত্তরে জানাল, কতকগুলো বছর নষ্ট

করে পাশ করে কেরাণী হওয়ার চেয়ে এখন থেকেই রেলগাড়ীর টি, টি, সি, হলে সকাল সকাল দু'পয়সা রোজগার করা যায়।

এরপর স্বস্তিকা তার মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলল কুলবন্ধুকে —তার প্রথম যৌবনের প্রথম পুরুষকে। আরম্ভ-যৌবনে আশাভঙ্গের এই প্রথম আঘাতটা সে ধীরে ধীরে স্বীকার করে নিল।

কিন্তু অবচেতন মনে ধীরে ধীরে সে তেমনি স্বীকার করে নিল অভিজিৎকে,—অভিজিৎ অনার্সে তার একমাত্র সহপাঠি। অভিজিৎ রণধীরের একেবারে বিপরীত। কথাবার্তায়, চালচলনে সে অদ্ভুত স্মার্ট। পড়াশোনায় তার যতখানি নয় ধীশক্তি, তার চেয়ে অনেক বেশী তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। কলেজের বিতর্ক, বাগ্মীতা প্রতিযোগিতায় গত দু'বছরের প্রথম পুরস্কারগুলি তার হাতছাড়া হয়নি। অনার্সের ছাত্ররূপে বইয়ের আদান-প্রদান তার প্রায়ই চলে স্বস্তিকার সঙ্গে।

একদা অভিজিতের অসাবধানতার কোনো অনির্দিষ্ট প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে তার রচিত একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা একটি বইয়ের মধ্য দিয়ে স্বস্তিকার হস্তগত হল। স্বস্তিকা কিন্তু একে অন্য অর্থে গ্রহণ করল এবং কয়েকদিন পরে কোনো অনির্দিষ্ট প্রেমিকের উদ্দেশ্যে রচিত এক কবিতায় তার উত্তর বইয়ের মধ্য দিয়ে তেমনিভাবে অভিজিতের হস্তগত করাল। স্বস্তিকার এই কবিতায় অভিজিৎ বুঝতে পারল তার হারান কবিতা কোথায়; কিন্তু বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও পুলকিত চিত্তে সে উপলব্ধি করল স্বস্তিকার হৃদয়ের অবস্থা। রোমান্টিক উপন্যাসের নায়কের মতো এক রোমান্টিক প্রেমিক নায়িকার প্রেমাস্পদরূপে সে নিজেকে অকস্মাৎ দেখতে পেল। এক রাত্রির রাজার মতো সে নিজেকে অসম্ভব প্রেমিক পুরুষরূপে দেখতে লাগল। ফলে কতকটা রোমান্টিক প্রেরণায়, কতকটা কৌতুকবসে সে পত্রপাঠ তার জবাব তেমনিভাবেই স্বস্তিকাকে দিল। এমনিভাবে কবিতার মধ্যে তাদের চলল মন দেওয়া-নেওয়া হৃদয়-

বিনিময়। ক্রমে কাগজের ভাষা থেকে এই হৃদয়-বিনিময় রূপান্তরিত হল মুখের ভাষায়।

ঠিক এমনি সময়ে তাদের মধ্যে অকস্মাৎ একদিন উপস্থিত হল রণধীর। সে স্বস্তিকাকে মোটেই ভুলতে পারেনি। দূরে গিয়ে স্বস্তিকাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার আরও বেড়ে গেছে। তার দিনের চিন্তায়, রাত্রির স্বপ্নে স্বস্তিকার ভাবনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই এই মর্মজ্বালায় বছর খানেক পরে উপস্থিত হয়েছে এই মফঃস্বল সহরে। মহানগরীর প্রগতির খরস্রোতে এক বছরেই সে অনেকখানি 'স্মার্ট বয়' বনে গেছে। তাই স্বস্তিকার সঙ্গে প্রথম থেকেই বেশ সহজভাবে মিশতে পারল এবং কথাপ্রসঙ্গে আপন হৃদয়ের কথা কায়দা করে ঘুরিয়ে বলল। তার বিশ্বাস—কুলবন্ত স্বস্তিকার জীবন থেকে সরে যাওয়ায় স্বস্তিকা হয়তো আজ তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে না।

কিন্তু এবারেও স্বস্তিকা তার প্রস্তাব না-মঞ্জুর করল; কিন্তু এবারে তার সুরটা ধমনীর নয়, সহানুভূতির। সে বলল,—আপনি ভালো ছাত্র, কেন মিছিমিছি এ নিয়ে এখন থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; পড়াশুনা করুন, বাংলাদেশে কী সুন্দরী মেয়ের অভাব আছে?—

সুতরাং বুকে বড় ব্যথা নিয়ে রণধীরকে ফিরতে হল কলকাতায়। কিন্তু যাওয়ার আগে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু কাঞ্চনকে অনুরোধ করে গেল যে কোন উপায়ে স্বস্তিকার একটি ফটো জোগাড় করে সে যেন তাকে পাঠিয়ে দেয়। কাঞ্চন কলেজের ছাত্র-সংসদের সাধারণ কর্মসচিব। স্বস্তিকা এই সংসদের মহিলা বিভাগের অন্যতমা সভ্যা। বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংসদের সভ্যদের যে গ্রুপ ফটো তোলা হয়, সেই গ্রুপ-ফটো থেকে স্বস্তিকার একটি পৃথক ফটো তুলে নিয়ে কাঞ্চন রণধীরের কাছে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে এদিকে ঘটল ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি।

ফাইন্যাল পরীক্ষার দিনকয়েক পরে অভিজিতের জন্মদিনে স্বস্তিকা তাকে নিমন্ত্রণ করল এবং সেই নিমন্ত্রণ-বাসরে সে অভিজিৎকে জানাল, 'শুভস্য শীঘ্রম্' সে নীড় বাঁধতে চায়। অভিজিৎ সহসা কোনো উত্তর দিতে পারল না এবং কোনো উত্তর না দিয়ে সেদিন সে চলে গেল। তারপর বহু ভেবে চিন্তে চিঠিতে জানাল তার বক্তব্য : যার মর্মার্থ,—জীবনে সে এতটুকু সুখী হতে না পারলেও তবু সে স্বস্তিকাকে জীবন-সঙ্গিনী করতে পারবে না। কারণ, যে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সে মানুষ, সে-পরিবারে স্বস্তিকার বধূ হয়ে থাকা শুধু হবে বিড়ম্বনা, জীবন তার শুধু ভরে উঠবে ব্যর্থতায়। সুতরাং……

সুতরাং স্বস্তিকা একেবারে গুম হয়ে গেল। এবং অভিজিৎকেও আর কোনো উত্তর দিলো না। কারো পায়ে সাধবার মেয়ে সে নয়।

অতএব সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে চাইল। ভর্তি হল এম-এ ক্লাসে।

কিন্তু পড়াশুনার বদলে সে নেমে পড়ল প্রগতি পন্থী রাজনীতিতে। অবন্তীর উৎসাহে সে যোগ দিল একটি পার্টিতে। অবন্তী শুধু তার সহপাঠি নয়, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের সেই পার্টির নেতাও। অবন্তীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বস্তিকা কিছুদিনের মধ্যে একজন ভালো রাজ-নৈতিক কর্মী হয়ে গেল। সে এখন শুধু 'পার্টি মিটিং' করে না, হরতালে, প্রশেসনে 'লিডিং পার্ট'ও নেয়। রাস্তায় গলা ছেড়ে পার্টির শ্লোগান আওড়ায়, মনুমেণ্টের নীচে জনসভায় প্রাণপণ চীৎকার করে বক্তৃতা দেয়। আবার মাঝে মাঝে পার্টির কাজে চলে যায় দূর দূরান্তের পল্লী অঞ্চলে। দিনের বেলায় মাঠে মিটিং করে, রাত্রি-বেলায় অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে একই ঘরে বিশ্রাম করে।

এইভাবে সে ধর্মে-কর্মে, শয়নে-ব্যসনে হয়ে উঠল অবন্তীর একনিষ্ঠ সঙ্গিনী এবং বিবর্তনবশে সঙ্গিনী থেকে হল সহধর্মিনী। অর্থাৎ এরপর

তাদের মধ্যে শুরু হল মর্মবদলের পালা। বেশীদূর অগ্রসর হতে-না-হতেই স্বস্তিকা হয়ে উঠল অন্তরাপত্যা। স্বস্তিকা ভয়ে একেবারে চুপসে গেল। কেলেঙ্কারী থেকে পরিত্রাণের আশায়, লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে এখুনিই বিয়েটা সারতে চাইল; কিন্তু অবন্তী সরে দাঁড়াল। সে জানাল, পার্টির সবার সঙ্গে যখন তার ঘনিষ্ঠতা, তখন শুধু তার একার ওপর দোষ চাপান স্বস্তিকার উচিত নয়।

কথাটা শুনে স্বস্তিকা কাঠ হয়ে গেল এবং তার জোর প্রতিবাদ করল।

ফলে তখন অবন্তী ধরল অন্য পথ। সে বলল,—শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য জুলুমবাজ শাসকদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করেছি। সংসারী সেজে সুখী হওয়া আমার কাম্য নয়। তা ছাড়া—

তাছাড়া কী?—অধীর হয়ে বলে উঠল স্বস্তিকা।

—ছেলেটা জন্মাক না, পার্টি থেকে মানুষ করবো—

—য়াঁ!—আঁৎকে উঠল স্বস্তিকা, বলো কী!—

—জানো তো, এমনও সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে কুমারীর সন্তানকে নষ্ট করা হয় না, আমাদের সে-আদর্শ স্থাপন করা উচিত—

—এদেশে সে-সমাজ ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি: তোমার আদর্শ তুমি পরে স্থাপন করো, এখন আমাকে উদ্ধার কর। মা-বাবার কাছে মুখ দেখাব কী করে—। অপমানে, ক্ষোভে সে কেঁদে ফেলল।

—তবে নষ্ট করে ফেল,—উপদেশ দিয়ে অবন্তী সরে পড়ল।

স্বস্তিকার মরে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু না মরে গোপনে মারল গর্ভের ভ্রূণকে। কিন্তু এর পরই সে জন্মের মতো তাদের দল থেকে বিদায় নিল এবং এম-এ পরীক্ষা দেবার জন্য বছর দুই পরে আবার পড়াশোনা সুরু করল।

এই সময়ে অবসর সময়ে মাঝে মাঝে স্বস্তিকার মনে পড়ে রণধীরকে। রণধীর এম-এ পাশ করে অধ্যাপনা নিয়ে বাংলার বাইরে কোনো কলেজে চলে গেছে—এর বেশী সে আর কিছু জানে না; জানার প্রয়োজন-বোধ করেনি কোনোদিন। অথচ আজ সে কোথায় আছে, কেমন আছে, তা জানার জন্য স্বস্তিকার মন মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। রণধীরের সঙ্গে শেষ যে-ব্যবহারটা সে করেছে, আজ যখন সেকথা মনে পড়ে, তখন সে অনুতাপের জ্বালায় পুড়ে মরে।

এম-এ পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বস্তিকাকে কাছে পাওয়ায় রণধীরের স্তিমিত-প্রায় প্রেম আবার জলে ওঠে। ফলে সে স্বস্তিকাদের বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করে দেয়। কিন্তু স্বস্তিকা তখন রাজনীতি ও অবন্তীর মধ্যে অন্তঃলীন, সুতরাং রণধীর তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই তাকে একটা শেষ কথা জানানর জন্য স্বস্তিকা তাকে একদিন ডেকে পাঠায়। নির্দিষ্ট সময়ে রণধীর স্বস্তিকাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেখে, স্বস্তিকা অবন্তীকে নিয়ে ব্যস্ত, সে এমনি ব্যস্ততার ভাব দেখাল যে তাকে বসতে বলার অবসর যেন পেল না। তথাপি রণধীর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে। আধ ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকার পরেও যখন স্বস্তিকা তার সঙ্গে একটাও কথা কইল না, তখন রণধীর বুঝতে পারে যে স্বস্তিকা তাকে অপমান করবার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছে। নিজেকে ভয়ানক অপমানিত বোধ করে রণধীর সেখান থেকে শেষ-বারের মতো বেরিয়ে আসে এবং বাড়ীতে এসে তক্ষুনিই স্বস্তিকার ফটোটা পুড়িয়ে ফেলে।

স্বস্তিকার মনে পড়ে' তার কাছে অপমানিত হয়ে যেদিন রণধীর তাদের বাড়ী থেকে চলে যায়; তারপর সে তাদের বাড়ীতে আর কখনো আসেনি; আর সেই থেকে সে তার সঙ্গে কখনো কথাও

বলেনি। নিজের সেই ভুল ও অপরাধের জন্য আজ স্বস্তিকা দুঃখ ও অনুতাপ করে।

তাই পরীক্ষার পর তার কর্মহীন মস্তিষ্কে, তার অলস চিত্তে বাসা বাঁধলো রণধীরের ভাবনা, রণধীরের ভালোবাসা।

অর্থাৎ সে এখন রণধীরকে পেতে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর উল্টোটাও ভাবে—রণধীর কী তাকে গ্রহণ করবে। নিজের অপরাধ স্বীকার করে তার পায়ে ধরে সে ক্ষমা চেয়ে নেবে, তাকে সে রাজি করিয়ে নেবে। কিন্তু এখন তার দেখা পাওয়া যায় কী করে।

অতি ঘনিষ্ঠ পুরানো কোনো সহপাঠীর বা সহপাঠিণীর দৈবাৎ দেখা পেলে সে তাদের কাছে রণধীরের খবর জিজ্ঞেস করে; কিন্তু তাদের কাছে কোন সঠিক জবাব পায় না।

কিন্তু একদিন এক অদ্ভুত অবস্থায় স্বস্তিকা রণধীরের দেখা পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এম-এ ডিপ্লোমা নিতে এসে সে দেখতে পেল রণধীরকে ডি-ফিল ডিপ্লোমা গ্রহণ করতে। রণধীর কবি এলিয়টের ওপর 'ডি-ফিল' উপাধি পেয়েছে। স্বস্তিকার চেতন মনে যেমনি বিস্ময়, অবচেতন মনে তেমনি আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। উৎসব শেষে সে রণধীরকে অনুসরণ করল।

অতি পরিচিত নারীকণ্ঠের ডাক শুনে রণধীর পিছন ফিরে তাকাল। স্বস্তিকাকে দেখে সে চমকে ওঠল; কিন্তু কোনো কথা বলল না, শুধু দাঁড়িয়ে রইল। স্বস্তিকা কাছে এসে তার ডি-ফিল পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানাল। রণধীরের লাজুক ওষ্ঠাধরে একটা করুণ হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর তারা পথ চলতে শুরু করল এবং এসে উপস্থিত হল হ্যারিসন রোডে। এখানে আপন আপন কাজ সারার পর রণধীর স্বস্তিকাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় উঠতে চাইল; কিন্তু স্বস্তিকা রাজি

হল না। সে নিজের বাড়ী গিয়ে চা খেতে চাইল এবং রণধীরকেও ডেকে বসল। রণধীর অস্বীকার করল, কিন্তু স্বস্তিকার প্রবল ইচ্ছা-শক্তির কাছে তার ওজর টিকিল না। সুতরাং উভয়ে ট্রামে চেপে বসল।

কিছুক্ষণ পরে স্বস্তিকাই প্রথম কথা পাড়ল,—দেশের কলেজ বলে তোমার আর ঐ বাঁকুড়া কলেজে পড়ে থাকা উচিত হবে না। কলকাতার কোনো ভালো কলেজে চেষ্টা কর।

—হ্যাঁ, এবার চেষ্টা করবো—। একটু থেমে রণধীর স্বস্তিকাকে জিজ্ঞেস করে,—তোমার চেহারাটা এতো বিশ্রী হলো কেন?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে স্বস্তিকা বলে,—সে অনেক কথা, মরতে মরতে কোনরকমে বেঁচে গেছি।

এরপর দুইজনেই চুপ করে যায়।

বাড়ীতে নিজের পড়ার ঘরে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করার পর অবশেষে স্বস্তিকা ধীরে ধীরে রণধীরকে জানাল আপন হৃদয়ের কথা আর ভুলের জন্য চাইল ক্ষমা।

রণধীর অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না—যেন সম্বিৎহারা। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে বলল,—স্বস্তিকা, বড় দেরী হয়ে গেল।

—সে তো যা হবার হয়ে গেছে; তুমি তো সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছ।

—না, সেদিক থেকে নয়—কিছু কুণ্ঠা প্রকাশ পেল রণধীরের কণ্ঠে।

—তবে?—কিছু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল স্বস্তিকার স্বরে।

—আসছে বুধবার আমার বিয়ে—সহজকণ্ঠেই বলে ফেলল রণধীর।

—বিয়ে! তোমার! কার সঙ্গে? লাভ-ম্যারেজ?—স্বস্তিকার অবস্থা বজ্রাহতের মতো।

স্বস্তিকার বাইরের এই উতলায় রণধীর বুঝে নেয় স্বস্তিকার ভিতরের

অবস্থাটি। সহানুভূতি মাখানো করুণস্বরে বলে যায়,—যাকে সব দিয়ে ভালো বাসলাম, তাকে তো পেলাম না। যাকে পাচ্ছি, তাকে এখনো দেখিনি সুতরাং···

—তাকে তুমি এখনো দেখনি!—

—না, বাবা দেখেছেন—

—না দেখেই তুমি তাকে বিয়ে করছো—

—হ্যাঁ, বাবা যখন দেখে মত দিয়েছেন—

—দেখতে সে সুন্দরী কী কুৎসিত···

এই কথায় বহুদিন আগেকার স্বস্তিকার একটা কথা তার মনে পড়ল। সুন্দরী বলে স্বস্তিকার যে-দাম্ভিকতা, আজকে তার রূপহীন দেহের পূর্ব দাম্ভিকতায় সে ঘা দিতে চাইল,—'বাঙলা-দেশে ত সুন্দরী মেয়ের এখনো অভাব ঘটেনি,—বলে সে বুক-পকেট থেকে তার ভাবী বধূর ফটো বের করে স্বস্তিকার হাতে দিল। তারপর বাঁ হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল,—ট্রেণের সময় হয়ে গেছে, আমি এখন চলি—

স্বস্তিকা 'থ' হয়ে গেল—যেন মোহগ্রস্ত: কোনো কথা সে বলতে পারল না। শুধু ফটোটি হাতে করে অপস্রিয়মান রণধীরের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল। তারপর রণধীর অদৃশ্য হতেই হঠাৎ ফটোটি চোখে চেপে টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল; আর তার তপ্ত অশ্রু শুধু ফটোর কুন্তল-স্তনভিন্ন এক যৌবন-মাদকতাভরা প্রেমময়ী তরুণীর অপরূপ আবেশময়ী মুখের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগল—যেন তা চিরন্তনকালের ব্যর্থ-প্রেমী নারীর হৃদয়-গলানো হাহাকারের সংবাদ চিরন্তনকালের প্রেম-ভাগ্যবতী নারীর কাছে বয়ে নিয়ে চলেছে···

পৌষ, ১৩৫৯

প্রফেসর বিপাশা সেন—

'ই-ভি' পেয়ে অর্থাৎ ইংরেজি ও বাঙলায় 'ডিষ্টিংশন' পেয়ে যে-মেয়েটি কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল, সে-ই যে প্রথম-বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফেল করবে, একথা অধ্যক্ষা অধ্যাপিকা কিংবা তার সহাধ্যায়িনীরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সংবাদটা শুনে বিস্মিত হল সবাই। দুঃখ প্রকাশ করলেন কোনো কোনো অধ্যাপিকা, সমবেদনা জানাল কোনো কোনো সহপাঠিনী এবং খুসী হল কেউ কেউ; কিন্তু মর্মাহত হলেন অধ্যক্ষা মিসেস ডরোথী মুখার্জী। তিনি তাকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ইংরেজিতে ফেল করলে কেন? দেখছি কলকাতায় এসে একবছরে একেবারেই বয়ে গেছ।'

লজ্জায় ও ভয়ে সবিতা আগেই আধ-মরা হয়ে গিয়েছিল। এখন এই ধমকে যেন একেবারে মরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল।

'কচি খুকী আর কী! কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। বুঝতে পারছ না নিজেও যেমনি ডুবছ তেমনি আমাদেরও যে নাম ডোবাচ্ছ। যাও, আড্ডা বাদ দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা কর।'

চোখ মুছতে মুছতে নীরবে সবিতা কোনরকমে বেরিয়ে গেল প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে।

গেল বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী চল্লিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একমাত্র সবিতা সাধুখান যখন ইংরেজিতে ডিষ্টিংশন পেল, তখন খবরটা পড়ে গর্বে ফুলে উঠেছিল প্রিন্সিপ্যাল ডরোথা মুখার্জীর বুকটা। যা পারল না একটাও ছেলে, একটা মেয়ে তাই পারল! তাই তিনি চিঠিপত্র লিখে খোঁজ নিলেন সবিতার। তারপর সবিতাকে মফঃস্বল

থেকে কলকাতায় এনে তার ও তার খরচের দায়িত্ব নিয়ে ভর্তি করলেন নিজের কলেজে।

আর সে-ই সবিতা বার্ষিক পরীক্ষায় করল ইংরেজিতে ফেল! কিন্তু সবিতা নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না তার ফেলের কারণ। সে কী সত্যই খুবই খারাপ লিখেছে! তার নিজের যতদূর বিশ্বাস সে খারাপ লেখেনি। তবে! অধ্যক্ষার ধমকটা মনে পড়ায় আর সে নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে পারল না।

কিন্তু ভাবতে পারল না সহপাঠিনীদের মন্তব্যগুলি তার অসাক্ষাতে কমনরুমে তাদের সেই তীক্ষ্ণ বাক্য-বান:

ফেল করবে না কেন, এরই মধ্যে প্রেমে পড়ে গেছে।' ঠোঁট বাঁকিয়ে মন্তব্য করল সবিতার রূপে ঈর্ষাকাতর মেঘবর্ণা নন্দিতা—সবিতার ফেলে যে সবচেয়ে খুসী।

'প্রেমে! কার!' সবিস্ময় কৌতূহলে সবাই তাকাল তার দিকে।

'সেই রকমই তো মনে হয়। দেখিসনি, মাস দুই থেকে ও কী রকম গম্ভীর হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে মেশে না।'

'তাই তো!' অনেকখানি নিবে গেল সবাই।

'বুঝতে পারিসনি বড়দিমনির রিমার্কটা। বা-ব্‌বা, যতোই ডুবে জল খাও, ওঁর চোখে ধরা পড়বেই।' চোখ পাকিয়ে টিপ্পুনি কাটল নন্দিতা আবার।

'ধরা পড়ল তো কী হবে। রূপ যখন আছে তখন প্রেম তো করবেই।' সবিতার পক্ষে একটু ওকালতি করতে চেষ্টা করল সেই বিনম্রা বিধু-মুখী মেয়েটি।

'রূপ থাকলেই বুঝি প্রেম করতে হয়!' বহু বান্ধবকে নিজের প্রেমে ফেলতে না-পারা ভগ্ন-মনোরথা নন্দিতা ব্যঙ্গ করে উঠল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর তাই তো ফেল করল।'

'ফেল করল তো কী হবে। যা রূপ আছে, তাতে যে-কোনো পুরুষ পাগল হয়ে যাবে, বিয়ে তো ওর আটকাবে না।' রূপহীনা নন্দীতাকে খোঁচা দিল সেই মেয়েটি।

কিন্তু খোঁচাটাকে গায়ে না মেখে পাশ কাটাল নন্দিতা, 'ওঃ! তুই বুঝি বিয়ের তরী পেরোবার জন্য পড়ছিস্।' কিন্তু আমাদের সবাইকে তাই ভাবালি কী করে! কার প্রেমে পড়েছিস্ ভাই।' অন্তরঙ্গতার ভানে কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে নিজের প্রসাধনাচ্ছন্ন বার্ণিশী মুখটিকে নন্দিতা তুলে ধরল সেই মেয়েটির রঙহীন মুখের উপর।

নিজের ঘরে বসে এই সব ভেবে ভেবে সবিতা দগ্ধ হতে লাগল তুঁষের আগুনের মতো। পরীক্ষায় ফেল নিয়ে তার সহুরে সহাধ্যায়িনীরা তার সম্বন্ধে এমন হীন মন্তব্য করতে পারে সে তা ভাবতে পারেনি।

কিন্তু তার গর্বের বস্তু তার রূপ নয়, তার মেধা; কিন্তু সেটা বুঝি গেল; নইলে সে ইংরেজিতে ফেল করল কী করে—

আর তাই সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করল, সে আর এদের কারও সঙ্গে মিশবে না এবং তার পুরানো নাম ফিরিয়ে আনবে।

সুতরাং সে সাধকের সাধনা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল এবং উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম কোনো দিকে না তাকিয়ে মরিয়া হয়ে একবছর সমানে পড়াশোনা করল; কিন্তু তার ভাগ্যের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে টেষ্ট পরীক্ষায় সে আবার ইংরেজিতে ফেল করল।

সংবাদ শুনে মূর্ছা গেল সবিতা! কিন্তু নন্দিতারা গোপন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল আর প্রিন্সিপ্যাল একেবারে দগ্ধচিত্ত হলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবিতা পরীক্ষা দেবার জন্য মনোনীত হল এবং পরীক্ষাও দিল।

পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল, সবিতা আবার 'ই-ভি' পেয়েছে এবং শুধু তাই নয়, ইংরাজিতেও রেকর্ড-মার্ক পেয়েছে।

সংবাদটা শুনে মুখটা পাঁশুটে হয়ে গেল শুধু ইংরেজির জুনিয়র প্রফেসর মিস বিপাশা সেনের।

অধ্যাপিকা মিস বিপাশা সেন ফার্ষ্ট ইয়ার ও সেকেণ্ড ইয়ারের শুধু প্রধান অধ্যাপিকা নন, তিনি ঐ দুই 'ইয়ারে'র প্রশ্ন-পত্র করেন এবং উত্তর-পত্রও দেখেন। যে-সবিতা ম্যাট্রিকে, আই-এতে ইংরেজিতে 'ডিষ্টিংশন' পায়, সে কেন প্রথম বার্ষিক ও টেষ্ট পরীক্ষায় ফেল করল—একথা যদি প্রিন্সিপ্যাল তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি তার কী উত্তর দেবেন। বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যাল কিংবা সবিতা কেউ-ই এ নিয়ে মাথা ঘামাল না; বরং হৈ-চৈ হতে লাগল সবিতার সাফল্য নিয়ে।

সুতরাং প্রফেসর বিপাশা সেন শেষ পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে এই কলেজেই পড়া সুরু করল সবিতা। এবং ভয়ানক উৎসাহে ও বিপুল উদ্যমে পড়াশোনা করতে লাগল। কিন্তু অসুখের জন্য তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারল না। তাতে কিছু এসে গেল না। সে চতুর্থ বর্ষে উঠে গেল। কিন্তু টেষ্ট পরীক্ষায় আবার দেখা গেল অনার্সের তিনটি উত্তর-পত্রে সে আবার ফেল করছে, বাকী তিনটিতে অনার্সের প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে।

এ-সমস্যা সৃষ্টি করল একটা জটিল পরিস্থিতি।

বিস্মিত হল সবাই।

কিন্তু বিস্মিত হলনা সবিতা নিজে। কারণ সে জানে, সব পেপারেই সে সমান লিখেছে, হয়তো উনিশ-বিশ; কিন্তু এমন আকাশ-পাতাল পার্থক্য হতে পারে না।

কাজেই সে সোজা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সবিতা আর সে গ্রাম্য-মেয়ে নেই, নেই সে আর বালিকা—

বিনম্রা, লাজুক, ভীতিবিহ্বলা। সে এখন বিশ বছরের সহুরে সুশ্রী মহিলা, শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা, আধুনিকা।

তাছাড়া, চার বছরের সহচর্যে ও প্রিন্সিপ্যালের আস্কারায় সে হয়ে উঠেছে অনেকখানি অন্তরঙ্গ।

তিনটি পেপারে ফেলের কথা শুনে অধ্যক্ষা মুখার্জী সবিতার উপর বেশ চটেছিলেন। এখন তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কী' ?

'অনার্সের ছ'টি পেপারেই আমি সমান লিখেছি। তিনটিতে ফাষ্ট ক্লাস পেলাম, আর তিনটিতে ফেল করলাম। এ কেমন করে হল বুঝতে পারছি না।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল সবিতা।

আরো বিরক্ত হলেন অধ্যক্ষা। তিনি আরো অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন। 'বুঝতে পারো না মানে! খারাপ লিখেছ ; তাই ফেল করছ। কিন্তু তোমার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি। তুমি তোমার শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুললে!'

যতোখ নি সাহস বুকে বেঁধে সবিতা আগের কথাগুলি বলেছিল, এবারে সেখানে ফাটল ধরে গেল। সে দমে গেল কিছুটা। তথাপি সে বলে ফেলল, 'আমি কোনো দিদিমনির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না। আমি শুধু বিপাশা দিদিমনির পেপার তিনটিতে ফেল করলাম ; অথচ প্রতিমা দিদিমনির মতো লোকের হাতে ও-রকম ভালো নম্বর পেলাম। তাই আমার মনে সন্দেহ হয়েছে।'

'মিস সেনের ওপর তোমার সন্দেহ হয়!'

'হ্যাঁ', শক্ত হয়ে বলল সবিতা, 'আই-এতে দু'টো পরীক্ষায় উনি আমাকে ফেল করালেন ; অথচ ফাইন্যালে যেমন লিখেছি, তেমনি সে-দু'টোতেও লিখেছিলাম। এবারও প্রতিমা দিদিমনির খাতায় যেমন লিখেছি, তেমনি ওঁর খাতায়ও।' একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে

সে হঠাৎ মরিয়া-হয়ে বলে ফেলল, ও-ই খাতা তিনটি যদি 'রি-এগ্‌জামিন করেন।'

'কী!···তোমার ধৃষ্টতা তো বেশ বেড়েছে। যাও—বেরিয়ে যাও।'

এরপর কোনো কথা না বলে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল সবিতা।

কিন্তু অধ্যক্ষা খুবই চিন্তিত হলেন সবিতার শেষ কথাগুলোয়। খানিকক্ষণ পরে উঠে গিয়ে আলমারী থেকে ব্যাণ্ডেল খুলে বের করলেন সেই তিনটি উত্তর-পত্র। খাতাগুলোর পাতা উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে যা দেখলেন, তাতে তিনি বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন ইংরেজির সিনিয়র প্রফেসার মিসেস প্রতিমা বোসকে। ইতিপূর্বের 'সবিতা-প্রসঙ্গ' না-জানিয়ে তাঁকে খাতা তিনটি দিয়ে শুধু বললেন, 'দেখবেন দেখি এই খাতা তিনটি, বেচারীকে পাশ করান যায় কিনা।'

পরদিন প্রত্যূষে অধ্যাপিকা বসু এসে পৌঁছলেন প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারে। বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'তিনটি পেপারই তো ফার্ষ্ট ক্লাস পাবার মতো; কিন্তু মিসেস যে কেন ফেল করালেন বুঝলাম না।'

'আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলে অধ্যক্ষা মুখার্জী সবিতার গত কালকার কথাগুলি জানালেন। তারপর বিপাশা সেনের কাছে যে মেয়েটি ফার্ষ্ট হয়েছে তার খাতা তিনটি বের করে বললেন, 'এই দেখুন করবীর খাতা। এর চেয়ে সবিতার লেখা কতো ভালো।'

করবী হলো সেই মেয়েটি—যার নাকের গড়ন সবিতার নাকের ঠিক একেবারে বিপরীত। সবিতার স্বর্ণাভ ধারাল মুখমণ্ডলের উপর তার নাকটি শুধু গ্রীক-ভাস্কর্যের নয়, গ্রীক-ললনারও নিখুঁত অনুকরণ। আর করবীর পীতাভ গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে তার নাকটি পীত-সাগরের তীরবর্তী

মঙ্গোলীয় রমণীর অনুকৃতি। কাজেই সবিতার নাম যেমন চোখে পড়ে সকলের ; তেমনি করবীরও।

দু'জনেই চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর প্রথম কথা বললেন অধ্যাপিকা ঘোস, 'মিস সেনকে একথা জিজ্ঞেস করলে হয় না।

'আমিও তাই ভাবছি।' চিন্তিত মনে বললেন অধ্যক্ষা মুখার্জী।

'তবে এখুনি ডেকে পাঠান।'

'ঠিকই বলছেন, আর আপনিও তো রয়েছেন।' বলে অধ্যক্ষা মুখার্জী মিস সেনকে ডেকে আনবার জন্যে চাকরকে প্রফেসার্স হোষ্টেলে পাঠালেন।

বিপাশা পৌছতে অধ্যক্ষা তাঁকে সব দেখালেন। দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'কেন এমন করলেন ?'

অন্তরে কেঁপে উঠলেন অধ্যাপিকা বিপাশা সেন। তিনি যেন ফাঁসীর আসামী। কাঠ-গোড়ার সামনে যেন বিচারক ডরোথী মুখার্জী।

'বলুন মিস সেন।' কৈফিয়ৎ চাইলেন অধ্যক্ষা।

তথাপি তিনি নির্ভিক, নিশ্চুপ।

'কথা বলছেন না কেন ? বলুন কেন এমন করলেন ?' এবার তাঁর অধ্যক্ষা-মূর্তি আত্মপ্রকাশ করল।'

'জানিনা,' যেন মরা-মানুষ কথা বলল।

'জানেন না !' বিস্ময় প্রকাশ করলেন অধ্যক্ষা মুখার্জী। 'জানেন না মানে ! ফাষ্ট ইয়ার থেকে করবীকে ফাষ্ট করাচ্ছেন আর সবিতাকে ফেল করাচ্ছেন। কেন এসব করছেন। করবী কী আপনার আত্মীয়া।'

লজ্জায় অপমানে মরে গেলেন অধ্যাপিকা বিপাশা সেন। শিউরে উঠে বললেন, 'আপনার এসব কথা বুঝতে পারছি না। ডেকে এনে

আমাকে অপমানিত করছেন কেন?' বলেই উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আর এরপর যা ঘটল, তা অতি সংক্ষিপ্ত। দিন দুই পরে তিনি স্কুল-সেক্রেটারীর কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন—দুর্নীতির জন্য কলেজ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কাজেই হোষ্টেলও তাঁকে ছেড়ে যেতে হল।

হোষ্টেল ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাঁর সহকর্মী-বান্ধবী মিসেস বাসনা রায়।

'তাহলে বোম্বে যাবেন ঠিক করলেন।' বললেন বাসনা রায়।

'হ্যাঁ, ওখানে দাদা ভারত সরকারের অধীনে চাকরী করেন। তার ওখানে উঠব। কলকাতায় আর আমার থাকবার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া, এখানে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই।'

'ওখানে কী করবেন ঠিক করছেন····· প্রফেসারী?'

'না, জীবনে আর মাষ্টারী করবো না।'

'তবে কী করবেন?'

'চাকরী। দাদাকে দিয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা করবো।'

বাসনা রায় ছেদ টানলেন এ-আলোচনায়। পাছে আবার সেই অপ্রিয় ব্যাপারটা এসে পড়ে। তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন।

কথায় কথায় কখন বাসনার এক বছরের খোকন বিপাশার কোলে উঠে গেছে। বিপাশা হঠাৎ তাকে বুকে চেপে আদরে পীড়ন করতে করতে তার তুলতুলে গালে চুমু খেতে লাগলেন।

খানিকপরে এ-উত্তেজনা কেটে যেতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিপাশা অকস্মাৎ বলে উঠলেন, 'আপনারা কতো সুখী।'

কথাটা ঠিক বুঝতে না-পেরে বাসনা রায় তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে।

'স্বামী-পুত্র নিয়ে আপনারা কেমন সুখের সংসার গড়ে তুলছেন।'

স্মিত হাসলেন বাসনা এবার। তারপর তেমনি হাসি-মুখে বললেন, 'আপনি কেন সংসার পাতলেন না।'

এ-কথায় অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল বিপাশা সেনের মুখটা; কিন্তু ওষ্ঠ-প্রান্তে হাসি টেনে বললেন, 'সংসার পাততে কোন্ মেয়ের না সাধ হয়।'

'তবে—' কী বলবেন ঠিক করতে না-পেরে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাসনা রায়।

'তবে আর কিছু নয়।' ব্যথাতুর হাসিতে বললেন বিপাশা, 'পাতবার সুযোগ পেলাম না।'

'আপনার বাবা বুঝি আপনার বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র করেননি?'

'করবেন না কেন।'

'আপনার বুঝি তাদের কাউকে পছন্দ হয়নি।' বাসনার ওষ্ঠাধরে কৌতুক।

'হবে না কেন।'

'তবে দাবী-দাওয়ায় বুঝি আপনার বাবা এঁটে উঠতে পারেন নি?' বাসনার মনে সীমাহীন কৌতূহল।

'না, তাও নয়।'

'তবে—' বাসনার অন্তর থেকে বিস্ময়-কৌতূহল ঠেলা দিয়ে উঠল। তিনি বিপাশার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজের প্রেমঘটিত বিয়ের কথা মনে-পড়ায় ঈষৎ হেসে উঠে বললেন, 'তবে আপনি যাঁকে ভালোবাসতেন, তিনি বুঝি আপনাকে 'বিট্রে' করেছেন?'

বহু কষ্টে এবার হেসে উঠলেন বিপাশা, 'না···না, আমার জীবনে ভালোবাসা-টালোবাসা কিছু ঘটেনি।'

এবার প্রশ্ন না-করে অদম্য বিস্ময় নিয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন বাসনা রায়। নারীর সেই আদিম কৌতূহল তাঁর সে-দৃষ্টিতে।

বিপাশা সেন যেন অকস্মাৎ অন্তরের তলদেশে তলিয়ে গেলেন। অতীত জীবনের গভীরতম ব্যথাটি—যেটি সময়ের ব্যবধানে ও কর্মের স্রোতে অবচেতন মনের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল, আজকে জীবনের আর একটি বেদনাময় অঙ্কে বাসনার বার বার প্রশ্নাঘাতে তা জেগে উঠল। তারপর এই নির্জন কক্ষে বিদ্যুতের মায়াময় আলোয় সমবয়সী এক নারীর কাছে আপন জীবনের গভীরতম ক্ষতটিকে তিনি উদ্ঘাটিত করলেন।

ম্যাট্রিক পাশের পরে আমার বিয়ের কথা উঠে, আর তা এম-এ-পাশ পর্যন্ত চলে। এই সাত বছরে জন কুড়ি পাত্র আমাকে দেখে, কিন্তু কারও আমাকে পছন্দ হয়নি।—'কী যেন বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত: করলেন বিপাশা, তারপর আবার বলে চললেন, 'কিন্তু একজনের আমাকে পছন্দ হয়েছিল, তবে তাকে আমি বিয়ে করতে রাজি হইনি। কারণ সে ছিল আই-এ, আর তখন আমি এম-এ ক্লাশের ছাত্রী।' একটু থেমে বিপাশা আবার বলে উঠলেন, 'তখন যদি রাজি হতাম, জীবনটা আজকে এমন শূন্য হয়ে উঠত না।' বিপাশার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

'কেন আপনাকে কারও পছন্দ হয়নি?' ভিজা গলায় বললেন বাসনা। সমবেদনায় তাঁর অন্তরটিও ব্যথাতুর।

বিপাশা যেন আর কথা বলতে পারলেন না। তিনি যেন সম্মোহিতা। তাই যেন সেই সম্মোহনে তাঁর হাত দুটি ধীরে ধীরে নাকের কাছে উঠে গেল। তিনি নাক থেকে চশমাটি খুললেন।

নাক দেখে বাসনা অবাক হয়ে গেলেন।

বিপাশার নাকের ঊর্ধাংশ যেন নাই—এমন চ্যাপ্টা যে যেন মিশে গেছে দুদিকের চোখের সঙ্গে।

অথচ বিপাশার নাকটা এতো চ্যাপ্টা বলে কখনও মনে হয়নি তাঁর।

আর তাই প্রফেসর বিপাশা সেন তাঁর এই অঙ্গ-ত্রুটিকে ঢাকবার জন্য বৈজ্ঞানিক কূট-কৌশল অবলম্বন করেছেন। অসম্ভব রকমের মোটা কালো ফ্রেমের জিরো পাওয়ারের ঈষৎ আকাশী রঙের একটা চশমা তিনি সর্বদা ব্যবহার করেন এবং ভুলেও তা কারো কাছে কখনও খুলেন না, এমন কি অধ্যাপনাকালে কিংবা প্রফেসার্স কমনরুমে।

চশমাটা পরে বুকের ভিতরের সব বাতাস বের করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বিপাশা সেন। যেন সম্মোহন থেকে কেটে উঠলেন। তারপর অতি আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার ভাগ্য-বিধাতা আমার প্রতি এমন বিরূপ; আমার মতো এক হতভাগ্য মেয়েকে দিয়ে আমার চরম লাঞ্ছনা করালেন।'

এই কথায় বাসনার অন্তর-দেশ অকস্মাৎ চমকে উঠল। স্তমিতা বাসনা যেন গুম হয়ে গেলেন। সবিতার ফেল-রহস্য তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

এমন সময় ভেজানো কপাট ঠেলে প্রবেশ করল হোষ্টেলের চাকর। ঢুকেই সে বিপাশাকে বলল। 'ট্রেণ ছাড়াতে তো ঘণ্টাখানেক বাকী।'

আসল অবস্থায় ফিরে এল দু'জনেই। বাসনা তাঁর ছেলেকে কোলে নিলেন। বিপাশা কব্জি ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'তাই তো,' এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

আশ্বিন, ১৩৬০

রূপের বেসাতি—

সুন্দরী সে—

কিন্তু কেমন সুন্দরী! সে কি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র-বর্ণিত পদ্মিনী নারী? না, তা নয়। তবে কী সে কালীদাসের কাব্যের নায়িকার মতো তম্বী শ্যামা শিখরা দশনা! না, তাও নয়। তবে

সে ইংরেজি রোমান্টিক উপন্যাসের নায়িকার মতো সুন্দরী—

তার ছাঁটা চুল অশ্বকেশরের মতো কোমল, রেশমের মতো চিক্কণ। দেহকান্তি তুষারের মতো শুভ্র, নবনীর মত পেলব। কপালখানি ছোট; কিন্তু সমুন্নত। চোখ দুটি যেমন দীর্ঘ আয়ত, নাকটি তেমন সুঠাম বঙ্কিম।

এরপর আর তার সারা দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ সেই দেহ-শোভার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পড়লে পুরুষ-চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে। সে যেন শুধু বসন্ত পূর্ণিমা-রাত্রির সহচরী—যেন এক রাত্রির কামনার মর্মসঙ্গিনী।

কারুকার্যময় সবুজ রঙের অপূর্ব একটি কক্ষে ততোধিক মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত কমনীয় একটি স্নিগ্ধ পালঙ্ক শয্যায় সুন্দরী শায়িতা। গবাক্ষ পথের প্রভাত-রবির সহনীয় আলোকে আঁখি দু'টি তার অর্ধ নির্মীলিত। প্রথম জাগরণের মধুময় অলসতায় তার শিথিল তনুখানি আবেশে ভরপুর।

কিন্তু একটু পরেই কোন অদম্য অভিযানের ব্যগ্রতায় সে দ্রুত উঠে পড়ল। সবুজ মখমল পাদুকায় পদদ্বয় আবৃত করে কক্ষলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করল। তারপর বেশ খানিকটা সময় নিয়ে প্রসাধনটি নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করল। তার রূপের জৌলুস আরো শতগুণে

খুলে গেল। সে যেন মর্তের মানবী নয়—স্বর্গের ইন্দ্রপুরীর কোন অপরূপ রূপসী অপ্সরী।

সুন্দরী ধীরপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল—যেন স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করছেন।

পাতলা স্বচ্ছ পর্দা ঠেলে সুন্দরী প্রবেশ করল ড্রয়িং রুমে। ড্রয়িং রুমে অপেক্ষমান চিন্তাক্লিষ্ট নির্বাক ব্যক্তিগণ চঞ্চল হয়ে উঠল, তারা নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল। তারা ওর বন্ধু—বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সুন্দরী এলিয়ে বসল একটা কোচে। তারপর বাম হাতটি বাড়িয়ে দিল বীরেনের দিকে। এম-বি ডাক্তার তরুণ বীরেন, তার নাড়ীটি খানিক টিপে রেখে বলল······না, সংঘমিত্রা, তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ।

এদিকে মনস্তাত্ত্বিক সুখময় গভীর অভিনিবেশে সংঘমিত্রার ভাব-ভঙ্গি, কথা-বার্তা লক্ষ্য করছে—সংঘমিত্রার মানসিক অবস্থাটি সে জানতে চায়। সাংবাদিক সমীরণ তার নোট বুকে কী যেন লিখছে, আর সাহিত্যিক গৌতম অনিমেষ নয়নে তন্ময় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বীরেনের কথায় হেসে সংঘমিত্রা বলে উঠল, তোমরা শুন্‌লে তো! আমাদের "ডক্টর বিধান" বিধান দিচ্ছে আমার আকাশ-পথে যাওয়া যেতে পারে,—আরে! সমীরণ, তুমি আবার লিখছ কী। তোমার মতো সাংবাদিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা দেখছি বিপদ।

—না, এমন কিছু নয়। তোমার কান্টিনেন্ট-টুরের প্রাক্কালে তার একটা রিপোর্ট তৈরী করছি! পত্রিকার সহর সংস্করণে যাতে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করছি।—বেশ, বেশ; বলি উদ্দেশ্য দিয়েছ কী—উচ্চ শিক্ষা না—

সমীরণের কিছুই বলা হল না। কারণ, খাবারের ট্রে হাতে ভৃত্য গোবর্ধনের আবির্ভাব ঘটল।

মিস্ সংঘমিত্রা চন্দ্রগড় রাজষ্টেটের চারি আনা শরিকের মালিক, নক্ষত্র নারায়ণের একমাত্র কন্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে আজ বছর তিনেক ধ'রে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে একই সঙ্গে তার ফাঁকা সময়টাকে আর পিতার অর্থের সদ্ব্যবহার করে চলেছে। সম্প্রতি তার কন্টিনেণ্ট-টুরের বাসনা জাগে এবং তাই আজই অপরাহ্ণে কে, এল, এম, বিমানযোগে তার যাত্রা সুরু হবে।

তাই সকাল সকাল উপস্থিত হয়েছে তার এই বন্ধুরা। তারা ওকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে। কিন্তু এই বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ব্যথার যে সকরুণ সুর বেজে উঠেছে, তা সত্যই করুণ।

একদা তার প্রত্যেকেই আশা করেছিল, সংঘমিত্রা তাকে ভালবাসে এবং এমন দুরাশাও পোষণ করেছিল যে, সে হয়তো তাকে জীবন-সঙ্গী করে ফেলতে পারে।

কিন্তু তারা বুঝতে পারত না যে, সংঘমিত্রা কোন একজনের সঙ্গেও বিয়ে-বন্দিনী সাজার পাত্রী নয়। সংঘমিত্রা সেই জাতের মেয়ে যারা চায় রূপমুগ্ধ একদল স্তাবক। তাই রূপসী সংঘমিত্রা তার অপরূপ তনুপুষ্পের চারদিকে রূপলুব্ধ গুঞ্জনরত একদল ভ্রমরও জুটিয়েছিল।

তাই অকস্মাৎ তার কন্টিনেণ্ট-টুরের বাসনায় এই ভ্রমরদল পেল গভীর আঘাত। সুতরাং বিদায় মুহূর্তে তাদের অন্তরে যে মর্মদাহী আলোড়ন সৃষ্টি হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে আঘাত পেল সাহিত্যিক গৌতম। বেচারী সংঘমিত্রার ছ'বছরের সহপাঠী—ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে সিক্সথ্ ইয়ার। তাই যেন সংঘমিত্রার ওপর তার দাবীটা ছিল সব চাইতে বেশী। সে যাবার সময় সংঘমিত্রার ডান হাতটা বুকে চেপে চোখ ছল-ছলিয়ে বলে বসল, মিতা, তোমার আশা আমি তাহলে ছেড়ে দিই—

সংঘমিত্রা বুঝতে পারে গৌতমের কথার অন্তর্নিহিত অর্থটি। তাই সে ঈষৎ হেসে সহানুভূতির সুরে বলল, গৌতম, তুমি বড্ড সেন্টিমেণ্টাল। তোমাকে কিংবা তোমাদের কাউকে যে আমি বিয়ে করব, এমন প্রত্যাশা করা তোমাদের ভুল। তোমাদের আমি তো শুধু বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছি—

* * * * *

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়োরোপের দেশগুলি ঘুরে সংঘমিত্রা একদিন উপস্থিত হল আমেরিকায় এবং রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় দলের নেত্রী শ্রীমতী পূরবী পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রসংঘে নারী-স্বাধিকার সংস্থার সহ সম্পাদিকা নিযুক্ত হল। ইয়োরোপে ভ্রমণকালে সে ইয়োরোপীয় দেশগুলির নারী-আত্মরক্ষা সংস্থার ও রেডক্রস সোসাইটির কার্যাবলী লক্ষ করত এবং এই জাতীয় বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিল।

কিন্তু বিদেশে এই কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও সে ভুলে যায়নি তার স্বদেশের বন্ধু-বান্ধবদের। তার চলতি-পথের কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আনন্দ, কতো কাহিনী ছত্রে-ছত্রে রূপায়িত হয়ে আসে তাদের কাছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে তায় আসে ভাঁটা। তাদের মধ্যে চিঠি-পত্রের লেন-দেন আসে কমে। সংঘমিত্রার রাষ্ট্রসংঘে জড়িত হবার পর তা প্রায় একরকম বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর বছর আষ্টেক পর একদিন সে সবাইকে জানাল তার ভারত-প্রত্যাবর্তনের সংবাদ।

কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের যথাসময়ে দমদম্ বিমান ঘাঁটিতে সে গৌতম, বীরেন, সমীরণ, সুখময়—এদের কাউকে দেখতে পেলনা। সংঘমিত্রা বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ার মত তার অবস্থা। অবস্থাটা সামলে নিয়ে সে ভেবে ঠিক করল, তারা ওর

অভ্যর্থনার জন্য তার বাড়ীতে নিশ্চয় অপেক্ষা করছে। কিন্তু বাড়ীতে পৌছে দেখলে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই পুরাতন ভৃত্য গোবর্ধন।

তারপর ....

তারপর পরদিন সকালে সে সমীরণের উপস্থিতির কার্ড পেল। অন্তরে আগ্নেয়গিরির ক্ষুব্ধতা নিয়ে, বাইরে অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সে নেমে এলো ড্রয়িং রুমে।

—কেমন আছো?

—তোমরা কি সবাই কলকাতা ছাড়া?

বহুদিন অ-দেখার পরে তার সহাস্য-কুশল প্রশ্নের এই জবাবে সমীরণ বিস্মিত হল। সে সংঘমিত্রার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল।

—কালকে বিমান ঘাঁটিতে তোমাদের উপস্থিতি আশা করেছিলাম।

ওঃ! তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু কাজের ভীড়ে যেতে পারিনি।

—কাজের ভীড়! —কাজের ভীড়ে সমীরণ এঁরি সঙ্গে এতদিন পরে দেখা করতে যেতে পারল না। সংঘমিত্রা যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে স্মরণ করতে লাগল, এই সমীরণই এক সময় তার সঙ্গে দেখা করার জন্য যে কোন জরুরী কাজ ফেলে রেখে তার বাড়ীতে ছুটত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে সহজ কণ্ঠে বলল, কাজের ভীড়ে তুমি গেলে না, আর ওরা?

—ওরা সবাই এখানে আছে!

—এখানেই আছে!

—হ্যাঁ, বীরেন তো এখন পাকা ডাক্তার, আর ঘোর সংসারী।

—মানে!

—ডাক্তারীতে তার যেমনি প্রসার, স্ত্রী আর একপাল ছেলেপিলে নিয়ে সে তেমনি বিব্রত।

—বীরেন বিয়ে করছে ?

—হ্যাঁ, তোমার কন্টিনেণ্টে যাবার দিন কয়েক পরেই—

—হুঁ,…একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল সংঘমিত্রার কণ্ঠ থেকে। —গৌতম ?

—গৌতম গেল বছর বিয়ে করেছে, বৌ'ভাতে বেশ খরচ করেছিলেন ওর বাবা।

—সুখময় !

—সুখময়ও অনেকদিন বিয়ে করছে, সেদিন ওর মেজ ছেলের অন্নপ্রাশনে খেয়ে এলাম।

—আর তুমি ! …জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে সংঘমিত্রা তাকিয়ে থাকে সমীরণের দিকে।

কিন্তু সমীরণ হাল্কা হয়ে হেসে উত্তর দিল, পরের সংবাদ খুঁজতে খুঁজতে সময়টা কেটে গেল, তাই নিজের সংবাদ রাখার সময় আর হল না। এ জীবনে এ আর হোলো না।

বুকের ভিতরের সব বাতাসটা বের করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সংঘমিত্রা যেন নিজেকেই বলল, ওরা বিয়ে করেছে, কিন্তু কেউ আমাকে তা জানায়নি। কালকে দেখা করতেও গেল না। অথচ একদিন ছিল যখন থাক্। তবু তুমি আজ এসেছ এই আমার সৌভাগ্য।

—আমি এসেছি অবশ্য আরও একটা কারণে। তোমার পশ্চিম-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর একটা রিপোর্ট তৈরী করতে চাই—

—আমার পশ্চিম-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর রিপোর্ট তৈরী করতে চাও, আর সেই মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার এখানে আগমন। —একটা ভয়ানক কঠিন বিস্ময় তার বুকে আছাড় খেয়ে পড়ল।

—আমি সাংবাদিক, সাংবাদিকতা যে আমার পেশা—সমীরণের সুরে বিনয়ের সুর।

—তুমি সাংবাদিক! …সমীরণ তুমি নও! সংঘমিত্রার কণ্ঠস্বরে যেমন শীতের রুক্ষতা, চোখে তেমনি আগুনের শিখা, জিহ্বায় তেমনি তরোয়ালের ধার,— এখন যাও সাংবাদিক। আমি ভয়ানক ক্লান্ত—

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত সংঘমিত্রা কোচ থেকে বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুতপদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

সংঘমিত্রা অকস্মাৎ বুকে যেন একটা ভয়ানক ব্যথা অনুভব করল, পায়ে যেন বাতের বেদনা বোধ করল। সে যেন সিঁড়ি দিয়ে আর উপরে উঠতে পারছে না। কোনরকমে ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দেওয়াল-প্রলম্বিত দীর্ঘ আয়নার সামনে সে থমকে দাঁড়াল। নিজের প্রতিবিম্ব সে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং দেখতে পেল, শুধু কপালে নয়, কপোলেও পড়েছে রেখা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

অনুস্যূত—

[বহুবাজারে একটি বোর্ডিং হাউসের ত্রিতলের একটি কক্ষ। সন্ধ্যা সাতটা। প্রতিভাবান তরুণ নাট্যকার সীতেশ রায় তার নূতন নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য সমাপ্তির জন্য দ্রুত কলম চালিয়ে চলেছে। এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করল মৃণ্ময় ঘোষ—তার বন্ধু, বহুদিনের বন্ধু : স্কুল-কলেজে তারা একই সঙ্গে পড়েছে, একই বিষয়ে দু'জনে এম-এ পাশ করেছে। বর্তমানে মৃণ্ময় করছে চাকরী, সীতেশ করছে সাহিত্য। সম্প্রতি মৃণ্ময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহাধ্যায়ী-বান্ধবা ধরিত্রী বসুর প্রেমে পড়েছে। ঘরে ঢুকেই সে সীতেশের খাটের উপর ধপ্ করে বসে পড়ল এবং বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল।]

সীতেশ [বিস্ময়াহত] : কি হয়েছে !

[মৃণ্ময় কোনো উত্তর দিল না। সীতেশ আবার বার দুই প্রশ্ন করল ; কিন্তু তারও জবাব না পেয়ে বিরক্ত হল বন্ধুর উপর। তারপর লেখার ফাইল ও পেন টেবিলের একধারে সরিয়ে রেখে বন্ধুর দিকে তাকাল। তার অবস্থা দেখে উপলব্ধি করতে পারল বন্ধুর কান্নার কারণ। তারপর উঠে গিয়ে বোর্ডিংয়ের চাকরকে চা দিয়ে যেতে বলে ফিরে এল]।

সীতেশ [বন্ধুকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে] : কি যে মেয়ের মত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে কাঁদ।

মৃণ্ময় [উঠে চোখ মুছে] : ঠাট্টা করছ। কিন্তু আমার যে কি দুঃখ ; সে তো তুমি বুঝবে না। [দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল]।

সীতেশ : না বললে বুঝব কি করে। শুধু চোখের জল দেখে তো বোঝা যায় না।

মৃণ্ময় [ব্যথিত হৃদয়ে]ঃ চোখের জল! আবার ঠাট্টা করছ। জানি, তুমি তা করবে; কিন্তু আমার বুকে যে কি ব্যথা—[আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল]।

সীতেশ [বন্ধুর ব্যথা লক্ষ্য করে]ঃ ধরিত্রী আজ তোমাকে কি বলেছে ?

মৃণ্ময় ঃ তা শুনে তোমার কী হবে ?

সীতেশ ঃ আমার কিছু হবে না সত্যি, যা হবে তা তোমারই। দেখ মৃণ্ময়, তোমাকে বহুবার বলেছি, কানের কাছে প্রেমের কথা সদা-সর্বদা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে বলতে থাকলে প্রেম টেকসই হয় না। প্রেমের মধ্যে থাকবে মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ, তবেই তো প্রেম দানা বাঁধবে, জমাট শক্ত হয়ে উঠবে।—

মৃণ্ময় [ক্রোধে]ঃ থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। কোনো মেয়ের প্রেমে তো কখনও পড়নি, আর কোনো মেয়েও তো তোমার প্রেমে পড়েনি। সুতরাং প্রেম সম্বন্ধে তুমি কি জান।

সীতেশ ঃ দেখ বন্ধু, প্রেম বলে কোন বস্তু নেই; আসলে ওটা সৃষ্টির সেই আদি কামনা।

মৃণ্ময় ঃ নিজের নাটকগুলোয় নানা কায়দার যে-প্রেম দেখিয়েছ, তাহলে সেগুলো কি ?

সীতেশ ঃ দেখ, সাহিত্য আর বাস্তব এক জিনিষ নয়।

মৃণ্ময় [ঈষৎ ব্যঙ্গ করে]ঃ তাই বুঝি তোমার নূতন নাটকটায় সেই নতুন তত্ত্বটা ঢোকাচ্ছ। মেয়েরা নাকি পুরুষের প্রতিভা, মস্তিষ্ক কিংবা মেধাকে ভালবাসে না, ভালবাসে পুরুষের দেহকে, তার সম্পদকে। [ক্রুদ্ধ স্বরে] দয়া করে ও-নাটকটার যবনিকা আর টেনো না; বরং পুড়িয়ে ফেল। মিথ্যে কথা লিখে কেন পাঠককে ঠকাও—

[চা হাতে চাকরের প্রবেশ]

সীতেশ : দেখছি, তুমি বড্ড চটে উঠছো। না, চা-টা খেয়ে নাও।

মৃণ্ময় [আরও একটু উত্তেজিত কণ্ঠে] : চটে উঠবো না কেন। আহা ! তোমার কথাগুলো কি মিষ্টি—

সীতেশ [গম্ভীর হয়ে] : দেখ বন্ধু, পৃথিবীতে তুমি প্রথম পুরুষ নও, যে নারীর প্রেমে প্রথম পড়েছে।

মৃণ্ময় : আমি হলপ করে বলতে পারি আমার মত কেউ কোনদিন তার প্রেমিকাকে এতো ভালোবাসেনি।

সীতেশ : জানো বন্ধু, তুমি যেখানে বসে যা বলছ, ওখানে বসে আমার আরও দু'একজন বন্ধু ঠিক ঐ কথাগুলি বলে গেছে।

মৃণ্ময় : তা হয়তো বলেছে ; কিন্তু আমার মতো অবস্থায় তারা নিশ্চয় কখনও পড়েনি।

সীতেশ [চিন্তা করে] : বেশ, অবস্থাটা বললে বোঝবার চেষ্টা করবো।

মৃণ্ময় : তাহলে মন দিয়ে শোনো। ধরিত্রী আজ আমাকে তার শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে,—[কাতর স্বরে] আমাকে আর তার ভালো লাগে না।—

সীতেশ [হতাশ-কণ্ঠে] : এই—

মৃণ্ময় : না, আরো আছে।

সীতেশ : তবে বলে ফ্যাল।

মৃণ্ময় [লজ্জা মিশ্রিত করুণ কণ্ঠে] : সে আমাকে বিয়ে করবে না।

সীতেশ [একটু ভেবে] : সে কি তার কোনো কারণ দেখিয়েছে ?

মৃণ্ময় : হ্যাঁ।

সীতেশ : কি ?

মৃণ্ময় [কাতর-কণ্ঠে] : সে অন্য একজনকে ভালবাসে।

সীতেশ : এঁ্যা ! কিন্তু কথাবার্তা শুনে তো সে-রকম কিছু মনে হয় না ; বরং তোমার উপর টান তো তার বরাবর বেশীই দেখছি—

মৃণ্ময় : তাইতো আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে ভালবাসে—

সীতেশ : তার সেই হতভাগ্য প্রেমিকটি কে ?

মৃণ্ময় : সে নাকি একজন প্রতিভাবান পুরুষ—

সীতেশ : এঁ্যা !

মৃণ্ময় : তাই সে বলল ।

সীতেশ : নাম বলেছে কি ?

মৃণ্ময় : না ।

সীতেশ [ভেবে] : তোমাকে একটা কথা বলবো ।

মৃণ্ময় : বলো ।

সীতেশ : তুমি অন্য মেয়ে বিয়ে কর । ধরিত্রীর আশা ছেড়ে দাও । যে-মেয়ে ও-রকম কথা বলে, তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না । [একটু ভেবে] তাছাড়া সংসার চালাবার জন্যে যে গৃহিণীপনার দরকার, ওর মধ্যে তা নেই । ও তোমার সহধর্মিনী হতে পারবে না ; শুধু হতে পারবে চা-পার্টি, বেবি-অষ্টিন, মেট্রো সিনেমার সঙ্গিনী—

মৃণ্ময় [করুণ কণ্ঠে] : আমি হাত জোড়ো করে বলছি, ওর সম্বন্ধে ও-রকম কথা তুমি বলো না । ওর এতটুকু নিন্দা আমি শুনতে পারি না । মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা যে কি জিনিষ, তা যে তুমি বোঝো না ।

সীতেশ [ব্যঙ্গ সুরে] : মন-প্রাণ দিয়ে কাউকে ভালো না বাসলেও এইটুকু বুঝি, প্রেম করে বিয়ে আর এমনি-বিয়ে দুই-ই সমান । বিয়ের পর দুটোই মনে হয় পিঁয়াজী আর আলুর চপ—

মৃণ্ময় [ক্রোধে] : তোমার ও-সব নাটুকে-কথা রেখে দাও । তুমি এখন আমাকে সাহায্য করবে কি না বল—

সীতেশ : কি সাহায্য ।

মৃণ্ময় : ধরিত্রীকে আমি চাই, ওকে না পেলে আমি বাঁচবো না ।

সীতেশ : আমি তোমাকে মরার হাত থেকে কি করে বাঁচাতে পারি।

মৃণ্ময় : আবার ঠাট্টা সুরু করলে।

সীতেশ : কিন্তু আমাকে কি করতে হবে বলবে তো।

মৃণ্ময় : ধরিত্রীকে বোঝাতে হবে।

সীতেশ : বোঝাতে হবে! [একটু থেমে] বোঝাতে হবে—তুমি মৃণ্ময়কে বিয়ে কর।

মৃণ্ময় : হ্যাঁ।

সীতেশ : হ্যাঁ! সে বুঝি কচি খুকী! তাকে বোঝাব মৃণ্ময়ের মতো পাত্র আর হয় না, কী শিক্ষায়, কী সম্পদে—

[মৃণ্ময় অকস্মাৎ সীতেশের ডান হাতটা চেপে ধরল]

মৃণ্ময় [সেই অবস্থায় অনুনয় করে] : তোমার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তোমার কথা সে শুনতে পারে, তুমি যদি আমার অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে বলতে পারো—[মৃণ্ময়ের চোখের কোণে জল দেখা দিল।]

সীতেশ [বন্ধুর চোখের দিকে চেয়ে তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করে] : কালকে ধরিত্রীর বাড়ীতে না হয় যাব। জীবনে না হয় একটা দৌত্যকার্য করা যাবে। তুমি অফিস ছুটির পর ওর বাড়ীতে যেও।

মৃণ্ময় [সন্দিগ্ধ চিত্তে] : সত্যি যাবে!

সীতেশ : সত্যি যাব।

মৃণ্ময় : [কৃতজ্ঞতভাবে] : সারাজীবন তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো।

সীতেশ [ঠাট্টা করে] : না, অতো ঋণী হয়ে কাজ নেই। বরং তুমি এখন নির্ভাবনায় যেতো পারো।

মৃণ্ময় : সত্যি যাবে তো।

সীতেশ : যাবো তো বললাম।

মৃণ্ময় : বেশ, তাহলে এখন চলি। [মৃণ্ময়ের প্রস্থান।]

: দুই :

[বালিগঞ্জ-হিন্দুস্থান পার্কের উপর দ্বিতল অট্টালিকার দোতালার একটি এ্যারিষ্টোক্র্যাটিক কক্ষ। সময় অপরাহ্ন তিনটে। কুমারী ধরিত্রী বসু পালঙ্কে শুয়ে একটি ইংরেজী উপন্যাস পড়ছে। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ—সীতেশ ও মৃণ্ময়ের সহপাঠিনী; শুধু সহপাঠিনী নয়, উভয়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এবং এই বন্ধুত্ব বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরেও অক্ষুন্ন রয়েছে। ধনীর নন্দিনী সে; তাই তার কর্মহীন ফাঁকা সময়টাকে হাই তুলে, উপন্যাসের পাতা উলটিয়ে বান্ধব-বান্ধবীদের সংগে আড্ডা দিয়ে কাটায়। তার বাবা ব্যারিষ্টার বি, বি, বসু তার বিয়ের জন্যে সামাজিক উচ্চমঞ্চের তরুণ ব্যারিষ্টার, আই-এ-এস, আই-পি-এস প্রভৃতি স্বর্গোদ্ভূত পাত্রের সন্ধানে আছেন; কিন্তু ধরিত্রীর নিজের তরফ থেকে এদিকে খুব একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। কিংবা সে যে কোনো বন্ধুর প্রেমে পড়েছে—এমন নজীর কেউ পায়নি, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত কেউ জানেনি, শোনেওনি; অবশ্য যদিও কোনো কোনো বন্ধু তার প্রেমে পড়েছে।

সীতেশের উপস্থিতি শ্লিপ পেয়ে সে পালঙ্ক থেকে ঝট করে নেমে পড়ল। অতি দ্রুত পুরো পোষাক বদলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেশ-বিন্যাস ঠিক করে নিল। তারপর ঠাকুরকে চা ও খাবার আনতে বলে দ্রুত অথচ লঘুপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।]

সীতেশ [ধরিত্রীকে ড্রয়িংরুমে ঢুকতে দেখে] : ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?

ধরিত্রী : না, শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম।

সীতেশ [হাসতে হাসতে] : তাহলে তো ছন্দ পতন ঘটালাম।

ধরিত্রী [হেসে] : বহুজনের তো ছন্দপতন ঘটিয়েছ এবং রাতদিন তো তাই করছো। না হয় আর একজনের ঘটালে। [ধরিত্রী সীতেশের সামনের কোচটায় বসে পড়ল।]

সীতেশ [প্রসঙ্গ পাল্টাবার উদ্দেশ্যে]ঃ কেমন আছো। বহুদিন তোমার সংগে দেখা হয়নি।

ধরিত্রী [কোপনতা দেখিয়ে]ঃ দেখা হবে আর কী করে। দেখা করবার ইচ্ছে না থাকলে—

সীতেশ [লজ্জিত কণ্ঠে বাধা দিয়ে]ঃ না · না, সত্যি ইচ্ছে ছিল ; সেদিন সত্যি একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম।

ধরিত্রীঃ জরুরী কাজ যে তোমার কী তা আমার জানা আছে— প্রকাশকের দোকানে কিংবা পত্রিকা অফিসে আড্ডা দেওয়া।

সীতেশ [ঈষৎ লজ্জিত হয়ে]ঃ না, সত্যি তা নয়। তোমার জন্মদিন উৎসবে যোগদান করতে না পারায় সত্যি আমি দুঃখিত।

ধরিত্রীঃ থাক্ মিছে দুঃখ করে আর কষ্ট পেও না ; কিন্তু তোমার জন্য সেদিন আমি যা অপমানিত হয়েছি।

সতীশ [বিস্মিত]ঃ আমার জন্য অপমানিত হয়েছো !

ধরিত্রীঃ হ্যাঁ, তোমার সংগে আমার দু'জন নতুন বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাদের কথা দিয়েছিলাম।

সীতেশঃ এ হে,—একথা আমাকে আগে জানালে না কেন? তাহলে যেমন করে হোক আসতাম।

ধরিত্রীঃ আহা! তাহলে যে আসতে না, তা আমার জানা আছে।

সীতেশঃ বেশ, আর একদিন তাদের নেমতন্ন করো। সেদিন আমি নিশ্চয়ই আসবো। বল, কবে করবে। দিনটা আগে থেকে জেনে যাই ; যাতে আর অন্যথা না হয়।

ধরিত্রী [ঈষৎ ব্যথিত কণ্ঠে]ঃ সেদিন তারা আমাকে যা মনে করে গেছে। তারপর তাদের আর নেমন্তন্ন করে তোমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছে নেই। [একটু থেমে] অথচ মৃণ্ময় বলল। সেদিন বিকেলে নাকি তোমার সংগে তার দেখা হয়েছিল, আর তুমি নাকি তাকে

বলেছিলে, নিশ্চয়ই আসবে। তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে—

সীতেশ [মৃণ্ময়ের নাম শুনে গতকালকার মৃণ্ময়ের অবস্থাটা মনে পড়ে গেল। এবং তার কথাগুলিও মনে পড়ায় মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল সে। আর তাই আলোচনাকে এদিক থেকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইল] : আবার কী হল তোমাদের মধ্যে ?

ধরিত্রী [বুঝতে না পেরে] : তোমাদের মানে !

সীতেশ : তোমার আর মৃণ্ময়ের মধ্যে।

ধরিত্রী [বুঝতে পেরে গম্ভীর ভাবে] : না, এমন কিছু নয়।

সীতেশ : কিছু নয় ঠিক নয়, তা না হলে—

ধরিত্রী [অস্থির চিত্তে] : তা না হলে কী ?

সীতেশ : তা না হলে ও আমার কাছে গিয়ে কান্না-কাটি করত না।

ধরিত্রী : কেঁদেছে ! আশ্চর্য ! ও সত্যিই বড্ড দুর্বল চিত্তের মানুষ।

সীতেশ : সকলের চিত্ত যে কঠিন হবে এমন কোনো মানে নেই।

ধরিত্রী [রুষ্টস্বরে] : মানে !

সীতেশ : মানে, বিধাতা সকলের চিত্ত এক ধাতু দিয়ে তৈরী করেন নি। তাই কারো চিত্ত পাষাণের মত কঠিন,—কঠিন আঘাতেও ভাংগে না ; কারো চিত্ত মাখনের মতো নরম—সামান্য তাপে গলে যায়।

ধরিত্রী [আরো রুষ্ট কণ্ঠে] : অর্থাৎ—

সীতেশ : অর্থাৎ-এর কোনো মানে নেই। যদি বা কোনো মানে থাকে, তা তো তুমিও জানো।

ধরিত্রী : মৃণ্ময় নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে।

সীতেশ : হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, তুমি তাকে আশা দিয়ে শেষটায় নিরাশ করলে—এটা তাকে খুব লেগেছে।

ধরিত্রী [ভীষণ বিরক্ত হয়ে] : ব্যাপারটা কিছু নয়। বন্ধুত্বের দাব

নিয়ে ইদানীং ও আমার উপর এক নতুন দাবী তুলেছে। তার সে দাবী মানতে আমি রাজি নই। সম্ভবতঃ এটাই তার কান্নাকাটির কারণ।

সীতেশ : কিছু মনে করো না তুমি। আমার পক্ষে এ-আলোচনা একান্তই অবান্তর। তোমাদের উভয়ের বন্ধু হিসাবে এই লজ্জাকর বিষয়ের অবতারণা। তোমাকে আর একটি কথা মাত্র জিজ্ঞেস করতে চাই।

ধরিত্রী : বলো—

সীতেশ : আমার বিশ্বাস মৃণ্ময়কে তোমার উপর ঐ নতুন দাবী পেশ করার সুযোগ তুমি দিয়েছিলে। আর সে সুযোগ নিয়ে সে যদি তা করে থাকে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না ; অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।

ধরিত্রী : বন্ধুরূপে আমি সবাইকে দেখেছি, মৃণ্ময় স্বভাবতঃ কোমল ভাব-প্রবণ। তাই হয়তো সে আমাকে ভুল বুঝেছে।

সীতেশ : তোমার ভুল কী তার ভুল বুঝিনা, তবে সম্প্রতি এক অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষের প্রতি তুমি নাকি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছ।

ধরিত্রী : নাটক লিখে লিখে কথাবার্তা যে একেবারে নাটকীয় করে তুলেছ। কথাটা কী সহজ ভাবে বলতে পারতে না।

সীতেশ : মৃণ্ময় যে ভাষায় বলেছে, আমি শুধু তার পুনরুক্তি করলাম, একটুও বাড়াইনি। যাক্, কথাটার মধ্যে বাস্তবতা আছে কী ?

ধরিত্রী : থাকতে পারে।

সীতেশ : তাহলে আমাদের কেউ নয় নিশ্চয়। সে প্রতিভাবান ভাগ্যবানের নামটি জানতে পারি কী ?

ধরিত্রী : সেই প্রতিভাবান ভাগ্যবান বিখ্যাত নাট্যকার সীতেশ রায়।

সীতেশ [আঁৎকে] : য়্যাঁ ! [সামলে নিয়ে] না, তোমার রসিকতাটা চমৎকার হলো।

ধরিত্রী : রসিকতা ! না, এর মধ্যে একবিন্দু রসিকতা নেই।

সীতেশ : তাহলে এক নূতন ধরণের ফ্লার্ট করলে বুঝি।

ধরিত্রী : [ব্যথিত হৃদয়ে] : তুমি মানুষকে এত আঘাত দাও কেন। কেন তুমি মাঝে মাঝে এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠ। [একটু থেমে] সেদিন যদি তুমি আসতে, তাহলে আজকে তুমি আমাকে এ-আঘাত দিতে পারতে না, আর মৃণ্ময়ও আমাকে তার বিয়ের প্রস্তাব করার সুযোগ পেত না।

সীতেশ [বিমূঢ় হয়ে] : তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না।

ধরিত্রী [ঈষৎ হাস্যে] : এতো বোঝো আর এই কথা বোঝো না। সেদিন তোমাকে আমার এই কথা জানাতাম। আর তা জানাজানি হয়ে গেলে মৃণ্ময় কখনও আর আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করত না।

সীতেশ : কী জানাজানি হয়ে গেলে,—আমাদের বিয়ের কথা !

ধরিত্রী : হ্যাঁ !

সীতেশ : কিন্তু মৃণ্ময় তোমাকে ভালোবাসে, সত্যি গভীরভাবে ভালবাসে।

ধরিত্রী : কিন্তু আমি তাকে চাই না,—আমি তোমাকে—তোমা—

সীতেশ [ধরিত্রীর কুণ্ঠিত কথাটিকে ধরে নিয়ে] : তুমি আমাকে চাও ; কিন্তু আমি তো বিয়ে করবো না। [একটু থেমে] দেখ, মৃণ্ময় সত্যি তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তুমি তাকেই বিয়ে কর। পাত্র হিসেবে সে কী অর্থে, কী রূপে আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতর।

ধরিত্রী : তোমাদের মধ্যে পাত্র হিসেবে কে যোগ্যতর, সে ভাবনা আমার। তবে তুমি কেন বিয়ে করবে না শুনি।

সীতেশ : কারণ অনেক। প্রথমতঃ [হেসে] মৃণ্ময়ের সংগে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাই না। দ্বিতীয়তঃ, এক সুন্দরীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে পৃথিবীর

অন্য সুন্দরীদের হেয় করতে চাই না। তৃতীয়তঃ, অর্থাৎ প্রধানতঃ আমি বন্ধন চাই না।

ধরিত্রী: ক্রমশঃ দেখছি চমৎকার কথা বলতে শিখছ। আচ্ছা, বন্ধন চাই না—মানে!

সীতেশ: মানে নারীর কাছে আমার স্বাধীনতা বিক্রি করতে চাই না। বিয়ে করা মানে একটি নারীর কাছে অসম্মানাস্পদ লজ্জাজনক সন্ধিতে আত্মসমর্পণ করা, আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে পরাভয় স্বীকার করা, আমার স্বাধীন আশ্রয় বিলিয়ে দেওয়া, আমার মনুষ্যত্ব বিক্রী করে দেওয়া, আমার—

ধরিত্রী: আঃ! আবার নাটক সুরু করলে। বলি, ধরাধামে বুঝি কোনো পুরুষ কখনও বিয়ে করে না। যতো সব —

সীতেশ: যতো সব কী?

ধরিত্রী: বাজে—খুব বাজে কথা শিখেছ। দেখ, নরনারীর মিলন—যাকে তুমি বন্ধন বলছ, তার মধ্যেই তো মানুষের মুক্তি। নরনারীর সেই মিলনের মধ্য দিয়েই তো আজো সে মুক্তি অব্যাহত। অ-বন্ধনই বরং সত্যিকারের বন্ধন, তা মুক্তি আনে না, মুক্তিকে রুদ্ধ করে।

সীতেশ [কিন্তু কিন্তু করে]: তোমার ও-যুক্তি সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

সীতেশ [আবার কিন্তু কিন্তু করে]: অন্ততঃ আমার পক্ষে নয়।

ধরিত্রী [আরো দৃঢ়কণ্ঠে]: তোমার পক্ষেও। যাও, আর বক্ বক্ করো না। [এমন সময় পিছনের পর্দা ঠেলে খাবার হাতে ঠাকুরের প্রবেশ]।

না, চা-টা খেয়ে নাও। মাথাটা তোমার ঠিক হোক।

সীতেশ [প্লেট থেকে খাবার তুলতে তুলতে]: না, মাথা আমার ঠিক আছে; তবে—

ধরিত্রী [চায়ে চুমুক দিতে দিতে] ঃ তবে আর কিছু নেই। ওঃ, এতোদিনে আমার মনটা হাল্কা হল। আমার কথা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন হতে সব ভাবনা তোমার। [প্রফুল্লচিত্তে চায়ে চুমুক দিতে লাগল]।

সীতেশ [চিন্তিতভাবে নীচের দিকে চেয়ে] ঃ তোমার ভাবনা ভাবতে গিয়ে তুমি আমাকে সত্যি ভাবনায় ফেললে। মৃণ্ময়কে কী বলবো। সে তো ছুটির পর এখানে আসবে।

ধরিত্রী [চমকে] ঃ তাই না কী! [নাক কুঁচকে] ও বড্ড বিরক্ত করে। [আবদারের সুরে] চল না একটু বেড়িয়ে আসি। পরে তুমি ওকে যা হয় বলো।

[ধরিত্রী উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চিন্তাক্রান্ত সীতেশের ডান হাত ধরে টান দিল। সীতেশ সে টানে ধরিত্রীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো ঃ রূপসী ধরিত্রীর মধুক্ষরা ওষ্ঠাধরের মধুবর্ষী হাসিতে কী দেখল কে জানে, সেও একটু হেসে উঠে দাঁড়াল]।

আশ্বিন, ১৩৬০

রবীন্দ্রনাথ

: এক :

'এতো চেঁচাচ্ছেন কেন, আস্তে চাইতে পারেন না।' বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে ইংরেজীতে বলে উঠল প্রেমসুরী।

সুশান্ত চমকে ঘাবড়ে গেল। তার খাবার চাওয়ার মধ্যে মেজাজ দেখাবার কি রয়েছে! একটু জোর কথা কানে গেলেই কি পাঞ্জাবী মেয়েদের মেজাজ এমন গরম হয়ে যায়! এ তার জানা নেই। কিন্তু সে-ও হটে গেল না; তেমনি গম্ভীর সুরে ব্যঙ্গ কণ্ঠে ইংরেজীতে জানাল, 'না।'

গলার স্বর আর এক ঘাট চড়িয়ে প্রেমসুরী বলল, যেন আদেশ দিল, 'তাহলে বাইরে গিয়ে চেঁচান। এটা খাবার ঘর, চেঁচিয়ে অন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারেন না। আপনার সে ভদ্রতা জ্ঞানটুক থাকা উচিত।'

সুশান্তের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল। প্রেমসুরীর অকস্মাৎ তার ওপর চটে ওঠার কারণ সে খুঁজে পায় না। কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে কঠিন কণ্ঠে তার প্রত্যুত্তর দিল. 'বাঙালী ছেলে শিখবে ভদ্রতা পাঞ্জাবী মেয়ের কাছ থেকে! হাসালেন মিস সুরী।' তারপর কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বলল, 'দেখুন, মিস সুরী! আপনার কাছ থেকে কিছু ভদ্রতা আশা করি।'

'কি বল্লেন! ভদ্রতা! মেয়েদের নিয়ে, তাদের নাম নিয়ে কবিতা লেখেন; সুতরাং বাঙালি ছেলে যে কতো বড়ো ভদ্র তা জানা হয়ে গেছে পাঞ্জাবী মেয়ের।'

'কবিতা! আমি লিখি! মেয়েদের নিয়ে! তাদের নাম নিয়ে!'

দিল্লীর ধূসর আকাশ থেকে তার রুক্ষ মাটিতে হঠাৎ যেন পাক খেয়ে খেয়ে পড়ে গেল সুশান্ত, 'এ আপনি কি বলছেন।'

'ন্যাকামিও বেশ জানেন দেখছি।'

সুশান্তের মনে হল প্রেমসুন্দরী তার পায়ের নাগরা জুতো খুলে ঠাস করে তার গালে যেন বসিয়ে দিল। জীবনে সে কোনদিন কোন মেয়ের কাছ থেকে এমন আঘাত পায়নি। এই বিদেশিনীর এই কড়া কথায় সেও কড়া জবাব দিতে চাইল—বাঙলা দেশের শ্যামলিমায় আজন্ম বাস করে বাঙালি তরুণীদের মসৃণ মুখ-লাবণ্য দেখে বাইশ বছর বয়সেও যে এক লাইন কবিতা লিখতে পারল না, দিনকতক দিল্লীর রুক্ষতায় বাস করে জনৈকা পাঞ্জাবী মেয়ের ততোধিক রুক্ষ মুখ দেখে তার পক্ষে রাতারাতি কবি হয়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বলল, বেশ মোলায়েম করে বলল, 'বেশ, এ সম্বন্ধে আপনি অধ্যক্ষাকে জানাতে পারেন; কিন্তু এখন আপনি দয়া করে চুপ করুন।' বলে সে খাবারের থালায় হাত দিল।

: দুই :

ঘটনা-স্থল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'সোস্যাল ওয়ার্কস্ কলেজ।' ইউনিভারসিটি রোড ও মল রোডের সঙ্গমস্থলে এই কলেজটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত মিলিটারী ব্যারাক সংস্কার করে প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিক ও সমাজ সংগঠনকার্য হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-দেওয়া এই কলেজের উদ্দেশ্য। ভারতের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত উক্ত বিষয়ে জ্ঞানলিপ্সু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজটি নির্দিষ্ট। ছাত্র-ছাত্রী সমসংখ্যক। একটি ব্যারাক কলেজ, একটি অধ্যক্ষা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কোয়ার্টার এবং অপরটি ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেল। হোষ্টেলটি পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট বহু ঘরে বিভক্ত—প্রত্যেকটি এক একজনের।

প্রেমসুরীর পাশের ঘরে থাকে বাঙলা থেকে সদ্যাগত জনৈক ছাত্র—সুশান্ত শাসমল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুশান্তই একমাত্র বাঙালি—অন্যান্যদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, মাদ্রাজী। ফলে সুশান্তের জীবনটা হয়ে উঠল বড্ড একক ও অস্বস্তিকর; তাই সে সময় কাটানোর জন্য পড়ত কবিতা আর প্রায়ই আবৃত্তি করত তার প্রিয় কবিতা 'শাজাহান'। এই কবিতাটির মধ্যে 'প্রেম', 'প্রিয়া', 'প্রেয়সি' শব্দগুলির আধিক্য থাকায় প্রেমসুরী সিদ্ধান্ত করে বসল সুশান্ত তাকে নিয়েই কবিতা লিখেছে। আর যখন-তখন কবিতাটি আবৃত্তি করায় সুশান্তের ওপর গিয়ে পড়ল তার সব রাগ; অথচ সহসা তাকে কিছু বলতে সাহস পেল না কিংবা অধ্যক্ষাকে ব্যাপারটা জানাতে কোথায় যেন তার বাধা ঠেকল। কিন্তু যতই দিন যায়, ততই সুশান্তের ওপর রাগ-দ্বেষ-ঘৃণা তার অন্তরে পঞ্জীভূত হতে থাকে। আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা-কাদা-ভস্ম পুঞ্জীভূত হতে হতে হঠাৎ একদিন বাইরে বেরোবার জন্য যেমন ক্রেটারের অপেক্ষায় থাকে; তেমনি প্রেমসুরীর অন্তরে সুশান্তের ওপর রাগ-দ্বেষ-ঘৃণা পুঞ্জীভূত হতে হতে তা যেন শুধু বাইরে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

আর আজ দুপুরে খাবারের ঘরে তা ঘটে গেল।

অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে একজন সহপাঠিনীর বিশেষ করে একজন অবাঙালি সহপাঠিনীর সংগে এমন অশোভন কথা কাটা-কাটিতে সুশান্তের মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। এখান থেকে বেরিয়ে গেলে সে যেন বাঁচে। তাই সে খাওয়াটা কোনমতে শেষ করতে চাইল।

খেতে খেতে সে ভাবল এবং ভেবে বুঝতে পারল প্রেমসুরী বাঙলা বোঝে না, তাই তাকে ভুল বুঝেছে। ভুলটা তার ভাঙ্গিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে ভবিষ্যতে এমনি অপ্রিয় কত অঘটন ঘটাবে। আহারান্তে

হাত-মুখ ধুয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে ঈষৎ বিদ্রুপের সুরে বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'হে আমার প্রিয়-বান্ধবী, আশা করি, আপনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন। যে কবিতাটি নিয়ে আপনি আমাকে এত নীচ ভেবেছেন এবং কেন যে ভেবেছেন তাও বুঝতে পেরেছি, জেনে রাখুন সে কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শাজাহান।' সম্রাট শাজাহান তাঁর প্রেয়সি মমতাজের কবরের উপর তৈরী করেছেন স্মৃতি-সৌধ যে তাজমহল, মহাকবির দৃষ্টিতে তা উদ্‌ভাসিত হয়েছে চিরন্তকালের এক সত্যনিষ্ঠ প্রেমের কীর্তিরূপে।' বলে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

প্রেমসুরী আঁৎকে 'থ' হয়ে গেল। সে যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে কুতুব-মিনারের চূড়া থেকে একেবারে নীচে পড়ে গেল।

ঃ তিন ঃ

ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত সবুজ ফ্ল্যাগষ্টাফ পাহাড়ের ওপর শরতের শুভ্র নীল আকাশ—তারই দিগন্তে অপরাহ্নের ম্লান সূর্য। সেই ম্লান সূর্যের শেষ রশ্মি-ছটা আকাশের দিগন্তে প্রসারিত। সেইদিকে চেয়ে সুশান্ত ভাবছিল নিজের কথা, ভাবছিল প্রেমসুরীর কথা ভাবছিল তার মেজাজের কথা। এমনি সময়ে 'যেতে পারি' শব্দে চমকে সে ফিরে তাকাল, দেখল তার ঘরে প্রবেশমানা প্রেমসুরী।

হতচকিত সুশান্ত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

তার এই ভাব দেখে প্রেমসুরী চাপা হাসি হেসে উঠল এবং ওষ্ঠ-প্রান্তে তারই রেশ লাগিয়ে বললো, 'আপনি দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন।·· না, না, আপনি ওখানে বসুন, আমি এখানে বসছি।' বলে সুশান্তের বিছানার এক প্রান্তে বসে পড়ল।

'আপনার কাছে মাপ চাইতে এসেছি।' বেশ সহজ কণ্ঠেই বলল প্রেমসুরী।

'মাপ চাইতে!' সুশান্ত একটু বিস্ময়-সুরে হেসে উঠল।

'না বুঝে আপনাকে অপমান করেছি,...'

তার কথাটা শেষ করতে না-দিয়েই সুশান্ত বলে উঠল, 'তাই মাপ চাইতে এসেছেন। কিন্তু...'

'এর মধ্যে আর কিন্তু নেই, ভুল করে যেমন বলে ফেলেছি, বাড়ী বয়ে তেমনি মাপ চাইতে এসেছি।'

'ভুলই বা করলেন কেন, বাড়ী বয়ে মাপই বা চাইতে এলেন কেন। তার চাইতে কথাটা তো সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন।'

'য্যা! আপনারা ভারী ইয়ে, এ-কথা কি করে সোজাসোজি আপনাকে জিজ্ঞেস করা যায়।' ব্রীড়ার একটা ক্ষীণ তরঙ্গ তার মুখে খেলে গেল।

'তার চাইতে বরং মুখের ওপর সোজাসুজি গালাগাল দেওয়া যায়, ক্যামন?'

'ওঃ আপনিও আর কম কিসে, আপনি বড্ড ঝগড়াটে।' প্রেমসুরীর ওষ্ঠ-প্রান্তে দুষ্টমিভরা স্মিত-হাসি।

'তা বটে!' সুশান্ত চুপ করল। আর কথা বাড়াতে চাইল না।

কিন্তু চুপ করে থাকা যায় না শুধু শুধু, কথা কিছু বলতেই হয়। তাই সে বলল, 'অতিথিকে অভ্যর্থনা করার মতো আমার তো এখানে কিছু নেই, যা আছে তা সিগারেট, আপনি তো তা প্রায় খান না।

দু'জনেই হেসে উঠল।

সুশান্ত একটা সিগারেট ধরাল। তারপর জানালার দিকে কুণ্ডলী করে ধোঁয়া ছাড়াতে লাগল। প্রেমসুরী উঠছে না দেখে শুধু কথা বলার জন্য সে পড়ার কথা পাড়তে চাইল; কিন্তু তার পূর্বে প্রেমসুরী বলে উঠল, 'এমন সুন্দর বিকেলে ঘরের মধ্যে চুপ কোরে বসে আছেন কি করে। চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।'

প্রেমসুরীর এই কথায় অবাক হয়ে সুশান্ত তার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে ভাবতে লাগল—একি সেই দুপুরের প্রেমসুরী ; না, অন্য কেউ। এ যেন সে নয়, যেন বহুদিনের ঘনিষ্ঠ কোনো এক বান্ধবী, প্রিয়-বান্ধবী। যে ঘণ্টাকয়েক আগে তার প্রতি এত নিদারুণ ছিল, এরই মধ্যে সে ঘনিষ্ঠ হতে চায়! পাঞ্জাবী তরুণীদের সম্বন্ধে তার নেই কোনো অভিজ্ঞতা। সে তাদের দেখেছে রাজধানীর রেস্তোরাঁয়, দিল্লীর পথে ; দেখেছে তাদের কফি-হাউসে, 'ভল্গা'-'আল্পস্' রেস্তোরাঁয় ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা পুরুষ বন্ধুদের সংগে নির্জলা ফ্লার্ট করতে। সে তাদের দেখছে সন্ধ্যার গোধূলি অন্ধকারে 'ফ্ল্যাগষ্টাফ পাহাড়ে', 'খাইবার পাশে', 'কাশ্মীর গেটে', যমুনার তীরে পুরুষ বন্ধুদের সংগে নির্ভেজাল ইয়ার্কী দিতে। প্রেমসুরী তো তাদেরই একজন। তাছাড়া, নারী চরিত্রের যে অতলান্ত দুর্জ্ঞেয়তার হদিস দেবতারা পান না, সে-ই বা তা পাবে কি করে ; সে মুখে বলল, 'কি করি বলুন। রাজধানীতে এই প্রথম এসেছি, রাজধানিক ভদ্রতার মাপকাঠি আমার অজানা। তার উপর এখানে আমি একা বাঙালি ; আপনাদের সংগে মিশতে ভয় করে কখন যে কার ভদ্রতার সীমা ডিঙ্গিয়ে যাব, আর...'

'আর প্রেমসুরীর খাবেন বকুনি। ক্যামন! না, আর কথা বলতে হবে না। তৈরী হয়ে নিন ; যাই, আমিও তৈরী হয়ে নি।' বলে সে বোম্বে সিনেমা-নায়িকার এক বিশেষ ভঙ্গিতে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

: চার :

মল রোড ধরে তারা চলতে শুরু করল। তারপর আলিপুর রোড না ধরে তারা ধরল ম্যাগাজিন রোড। অবশেষে তারা এসে পৌছল যমুনা নদীর তীরে। লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রান্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদী। বাঙলা দেশের নদীর দুই দিকে যেমন আম-

জাম, বাঁশ-বেতস, তাল-নারিকেল প্রভৃতি গাছের সারিবদ্ধশ্রেণী অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃত, দিল্লীর যমুনা নদীর তীরে সেরূপ বৃক্ষশোভা নেই, ধূসর প্রান্তের উপর দিয়ে ভীরু প্রাণচঞ্চলা রিক্তা যমুনা দয়িত-সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবমান। তার তীরে দু'চারটে বিচ্ছিন্ন যে সব গাছ রয়েছে, তাদের অধিকাংশই নিম, কিছু বাবলা ও অন্যান্য দু'একটা ভিন্ন শ্রেণীর গাছ। দিল্লীর বিস্তৃত প্রান্ত যেখানে নদীতটের দিকে লজ্জানম্র বধূর মত নুয়ে যমুনার কালো কোলে আত্মসমর্পিত, সেই নুয়ে-পড়া ঢালের মুখে এক স্থানে একটা বড় নিমগাছ উন্নত মস্তকে গগন চুম্বন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার তলদেশে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে সুশান্ত ও প্রেমসুন্দরী মুখোমুখি বসল।

পথ চলতে চলতে তারা পরস্পরের যে পরিচয় দিচ্ছিল, তারই জের ধরে প্রেমসুন্দরী বলে যায়, ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে তার দাদা নিহত হয়, লাহোরে তাদের নিজেদের ঘরবাড়ী সব নষ্ট হয়ে যায়। তার বাবা আই-সি-এস অফিসার বলে বেঁচে যান, মাকে নিয়ে কোনরকমে দিল্লীতে সরে পড়েন। সে নিজে তখন দিল্লীতে, সে তখন ছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী···

সুশান্ত বলে যায়, বাঙলা দেশও সাম্প্রদায়িক বর্বরতা থেকে রেহাই পায় নি ; কিন্তু তারা পেয়েছিল। কারণ, তাদের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে— বিয়ালিশের আগষ্ট আন্দোলনের তীর্থভূমি মেদিনীপুরে। কিন্তু ইংরেজের অত্যাচার থেকে তারা রক্ষা পায় নি। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তার বাবা শিক্ষকতা ছেড়ে তাতে যোগদান করেন। ফলে তাঁর সারাজীবন একরকম কাটে জেলে। আগষ্ট আন্দোলনেও তারা পেয়েছে অমানুষিক নির্যাতন···

এমনিভাবে তারা পরস্পর পরস্পরের কথা জানায়, পরস্পর পরস্পরকে জানতে থাকে···

কিন্তু জানতে পারে না সূর্য কখন যমুনার ওপারে ডুবে গেছে, জানতে পারে না কখন যমুনার কালো জলে কুয়াসার মসীরেখা ফুটে উঠেছে, জানতে পারে না কখন চতুর্দশীর চাঁদ দিল্লীর ধূসর প্রান্ত থেকে দূর শুভ্রাকাশে উঠে গেছে…

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দু'টি তরুণ-তরুণীর হৃদয় এক হয়ে মুখর হয়ে উঠেছে দিল্লীর প্রান্তদেশে যমুনার তীরে। কথা তাদের ফুরায় না, যেন ফুরাবে না। ব্যক্তিগত আলোচনা রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ব আলোচনায়—আমেরিকা-কোরিয়ায়। সে আলোচনা কখন মোড় ফিরেছে সমাজনীতিতে। আবার কোন্ অবসরে তায় এসে পড়েছে সাহিত্য, এসেছে রবীন্দ্রনাথ, এসেছে তাঁর অমর কবিতা 'শাজাহান'।

'কবিতাটি একবার আবৃত্তি করুন না। শুনতে ভারি ভালো লাগে। হঠাৎ বলে উঠল প্রেমসুরী। কণ্ঠে তার অনুরাগ।

সুশান্ত কিছু বলল না, শুধু মৃদু হাসল।

'হাসছেন যে'—

'এমনিই', বলে সে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করল। তারপর বলল, 'শুনুন'।

সুশান্ত যমুনার দিকে চেয়ে গভীর আবেগে সারা কবিতাটি আবৃত্তি করে গেল তার সেই কণ্ঠে, যে কণ্ঠ পেয়েছে বহু আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার। আর প্রেমসুরী তন্ময় হয়ে শুনে গেল, কিন্তু বুঝতে পারল না তার শব্দার্থ ; শুধু শব্দার্থ অতিক্রান্ত অব্যক্ত সুর-মূর্ছনা তাকে নিয়ে গেল কোন্ এক সুদূর সুরলোকে। তার সমগ্র অনুভূতি, তার সমস্ত হৃদয় এক অনির্বচনীয় পুলকে মথিত ঃ সে বিহ্বল।

'ক্যামন লাগল ?'

'খুব ভাল', যেন ধ্যান-ভঙ্গে বলল প্রেমসুরী, 'বাঙলা তো বুঝি না, ইংরেজিতে কবিতাটি আমায় বুঝিয়ে দিন।'

'কবিতা তো আসলে কানে শোনার জিনিষ, ওতো ব্যাখ্যার বস্তু নয়। তাছাড়া এ কবিতা ভাষান্তর বা ব্যাখ্যা করা একটা অসাধ্য ব্যাপার; তবু আপনাকে বোঝাবার সাধ্যমত চেষ্টা করছি।'

শোনো শেষে প্রেমসুরী সুশান্তকে জিজ্ঞেস করল, 'মমতাজের প্রতি সম্রাট্ শাজাহানের প্রেম এতো গভীর ও একনিষ্ঠ ছিল কি?'

প্রেমসুরীর এ হেন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সুশান্ত, একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই না, বহু বেগম পরিবৃত বাদশার মমতাজের প্রতি প্রেম কখনই গভীর ও একনিষ্ঠ হতে পারে না। এটা মহাকবির দৃষ্টি এবং সৃষ্টিও। তাজমহল তৈরীর মূলে শাজাহানের প্রেরণা কি ছিল,— সে তার বেগম মমতাজের বিরহের স্মৃতিকে অমরতা দেবার জন্যে, না তার নিছক সৌন্দর্য-পিয়াসী হৃদয়ের আহ্বানে; না রাজ্য-জয়ে অপরাগ বাদশার বাদশাহী-খেয়ালে—কোন্‌টা যে সত্য, তা জোর করে আজ কিছু বলা যায় না। তবে এই কবিতায় মহাকবি চিরন্তনকালের প্রেমের শাশ্বত সত্য রূপটিকে তাজমহলরূপী একটি বস্তুর মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।'

'আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সর্বদেশের সেরা কবি কি?' প্রেমসুরী আবার প্রশ্ন করে বসল।

সুশান্ত সাহিত্যের জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের মত উত্তর দিল, 'এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। তবে একথা সত্য যে, তিনি সর্বকালের সেরা গীতিকবি। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো যুগের একজন লেখক সাহিত্যের সর্ববিভাগে তাঁর মতো এতো দক্ষতা দেখাতে পারে নি। আপনি তো বাঙলা জানেন না যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় জানবেন।

'আমি বাঙলা শেখব।' আবেগে হঠাৎ বলে বসলো প্রেমসুরী।

'হ্যাঁ!' আঁৎকে উঠল সুশান্ত, 'বলেন কি!'

'রবীন্দ্রনাথের বই বাঙলায় পড়বার জন্যই বাঙলা শেখব।'

'তবে আর কি, এখানের একটা বাঙলা পাঠশালায় ঢুকে পড়ুন।' সুশান্তের কণ্ঠস্বরে ঠাট্টা।'

'না, সত্যি বলছি, আমি বাঙলা শেখব।' কণ্ঠে তার অনুরাগ-ভরা আগ্রহ।

সুশান্ত ভাবল, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতো কথা শুনে প্রেমসুন্দরীর বিভ্রান্তি ঘটেছে। তাই বাজে বকতে সুরু করেছে। কাজেই এই আলোচনার ছেদ টানবার জন্য সে বলল, 'বেশ এখন উঠুন দেখি, রাত্রি অনেক হয়েছে। মিস্ জোন্‌স্ কি ভাববেন।' বলে সুশান্ত উঠে দাঁড়াল।

প্রেমসুন্দরী উঠতে উঠতে বলল, 'মিস্ জোন্‌স্ কিছুই বলবেন না। আমি বলছি, আমি বাঙলা শেখবই, আর আপনাকে তা শেখাতেই হবে।' একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবী-কণ্ঠে বলল প্রেমসুন্দরী!

'য়্যাঁ!' সুশান্তের এবার মনে হল প্রেমসুন্দরী যেন তাকে ঠেলে দিল যমুনার কালো জলে, 'সে কি করে সম্ভব!'

'অসম্ভব বলে কিছুই নেই। আপনি রাজি কিনা বলুন।'

'বেশ, সে পরের কথা। আপনি এখন চলুন।' বলে সুশান্ত চলতে সুরু করল।

প্রেমসুন্দরী তাকে অনুসরণ করল।

: পাঁচ :

সুশান্ত কোনদিন ছাত্র-ছাত্রী কিছুই পড়ায় নি; এখন একজন সমবয়সী এবং সহপাঠিনী ছাত্রী পেয়ে বড়ই আমোদ ও কৌতুকবোধ করল। এবং সেই প্রেরণায় সে প্রেমসুন্দরীকে নিয়ে বাজার থেকে কিছু শিশু-বাঙলা-বই কিনে আনল।

সত্য সত্যই প্রেমসুন্দরী মরিয়া হয়ে বাঙলা পড়তে সুরু করল—বিকেলের অবসর সময়ে আর 'ফিল্ড ডিউটি'র মাঠে।

সোস্থাল ওয়ার্কস কলেজের পঠন-পাঠন সাধারণ স্কুল-কলেজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকালে ঘণ্টা দু'য়েক ক্লাসে যা পড়ান হয়, তারপর ঘণ্টা দু'তিনেক তার ফিল্ড ডিউটি করতে হয়। একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী নিয়ে এক একটি দল গঠিত এবং সহর থেকে দূরে গ্রামে-গ্রামান্তরে তাদের ডিউটিতে যেতে হয়। সাধারণতঃ কাজ সেরে একটার মধ্যে ফিরতে হয়। প্রেমসুরী সুশান্তকে নিয়ে তাদের দল গঠন করল এবং দিল্লী থেকে মাইল বার পশ্চিমে পাঞ্জাবের অন্তর্গত নাজাফগড় গ্রামের 'গান্ধী সেবামন্দিরে' এবং তার আশে-পাশের গ্রামে তাদের ফিল্ড ডিউটি বেছে নিল।

'গান্ধী সেবা-মন্দিরে তাদের ডিউটি—নার্সিং শিক্ষা করা, রোগীদের তদারক করা এবং খরচ-খরচার হিসেব পর্যবেক্ষণ করা; আর গ্রাম্য ডিউটি—গ্রামের বিশেষ কোনো চৌমাথায় বসে পথের সব নরনারীর আনাগোনার হিসেব করা; জীবিকা-সংস্থান অনুযায়ী তারা কত শ্রেণীর মাঝে মাঝে কোনো কোনো গ্রামে প্রত্যেক বাড়ী ঘুরে ঘুরে তাদের ও তাদের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান তৈরী করা, ইত্যাদি।

গ্রাম্য-চৌমাথায় ফিল্ড ডিউটিকালে গাছের তলায় প্রেমসুরী সুশান্তের কাছে বাঙলা পড়ে। হোষ্টেলের চাইতে সেখানে সে পড়তে ভারি উৎসাহ পায়, ভারি আমোদ পায়। সেখানটা বেশ নিরিবিলি, শুধু তারা দু'জন। কোনো সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এসে পড়ে না তাদের উপর।

এমনিভাবে চলে প্রেমসুরীর বাঙলা-পড়া···

এলো গরমের ছুটি। প্রেমসুরী বাড়ী গেল না, আর সুশান্তকেও যেতে দিল না, সে এই ছুটিটা বাঙলা পড়ায় লাগাবে। এবং লাগালও। সে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঙলা-সাহিত্যে বেশ খানিকটা বোধগম্যতা অর্জন করল।

আর তাই সে গুরু-দক্ষিণার নামে সুশান্তের জন্মদিনে তাকে দিল উপহার—সিল্কের পাঞ্জাবী আর তাঁতের ধুতি।

'এ কী! স্যুট না দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী যে?'

'স্যুটে আপনাকে ভালো মানায় না, ধুতি পাঞ্জাবী বেশ মানায়।'

'—'রবীন্দ্রনাথ' পড়ে দেখ'ছি আপনার চোখ বদলে গেছে।'

দু'জনেই হেসে উঠল।

আবার প্রেমসুন্দরীর জন্মদিনে সুশান্ত তাকে দিল 'সঞ্চয়িতা' আর শাড়ী।

'সঞ্চয়িতা' পেয়ে প্রেমসুন্দরীর আনন্দ কানায় কানায় উপচে উঠল; কিন্তু শাড়ী দেখে তার মন তেমনি চুপসে গেল, 'শাড়ী! ও-তো আমি কখনও পরি নি।'

'শাড়ীতে আপনাকে সুন্দর মানাবে, শালোয়ারে আপনাকে বিশ্রী দেখায়।'

আবার দু'জনে হেসে উঠল।

কিন্তু এই সামান্য শাড়ী তাকে করে তুলল অসামান্য। শাড়ী পরিহিতা প্রেমসুন্দরীকে দেখে হোষ্টেলের ছাত্র-ছাত্রীরা হল অবাক্। তারা বিস্মিত-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে; তারপর বাস্তবতা উপলব্ধি করে মুখ টিপে হেসে সরে পড়ে। অ-দেখার দল যারা তার সাজ-সজ্জার রূপকথা শুনল, তারা ত্বরিতে তার দরজার কাছে চক্র দিয়ে দিল। হোষ্টেলটি হয়ে উঠল সরগরম—চাপা হাসিতে আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে: 'শালোয়ার ছেড়ে পরেছে শাড়ী অর্থাৎ পাঞ্জাবিনী হলেন বাঙালিনী,' 'বাঙলা শিখে হয়েছিলেন সিকি বাঙালিনী, শাড়ী পরে হলেন অর্ধেক, তারপর ঐ বাঙালির অর্ধাঙ্গিনী হয়ে হবেন পুরো বাঙালিনী।' ইত্যাদি।

ফলে এই ঘটনাই তাদের জীবনের মোড়কে ফিরিয়ে দিল ভিন্ন পথে। তারা সহপাঠি-সহপাঠিনীদের ঈর্ষা বাড়িয়ে তুলতে চাইল। তাই তারা ঠিক করল, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলবে বাঙলায়, আর ব্যবহার

করবে শাড়ী-ধুতি। আর তারা তাই করতে লাগল। ফলে তাদের ঘনিষ্ঠতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠল। কিন্তু তাদের এই ঘনিষ্ঠতা অন্যান্যদের চিত্তে যেমন সৃষ্টি করল ঈর্ষা, তেমনি তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করল এক নূতন সমস্যা—তারা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না : সকালে এক সংগে ক্লাসে পড়ে, ফিল্ড ডিউটিতে এক সংগে কাজ করে, বিকেলে এক সংগে বেড়াতে বেরোয়—যমুনার তীরে, ফ্ল্যাগষ্টাফ পাহাড়ে, কার্লটন হোটেলে, ফিরোজ শা কোটলায়, কনট সার্কাসে, কনট প্লেসে—এক একদিন এক এক জায়গায়।

: ছয় :

এমনিভাবে তাদের কেটে যায় দিন……

কেটে যায় মাস……

কেটে যায় বছর……

কিন্তু তারা তার হিসেব রাখে না, যেন রাখতেও চায় না।

তবু রাখতে হয়। হিসেব তাদের সামনে এসে পৌঁছে, তাদের জানিয়ে দেয়—বছর হয়েছে শেষ।

সূর্যদেবের কাছ থেকে এ খবর আসেনি, এসেছে অধ্যক্ষা মিস্ জোন্‌সের কাছ থেকে। পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেল ত্যাগ করতে হবে।

শরতের নির্মল আকাশে ডানা মেলে উড়ে-বেড়ানো সাদা হাল্কা মেঘ ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে হঠাৎ বৃষ্টিরূপে যেমন পৃথিবীতে নেমে আসে, তেমনি তারাও কল্পনার আকাশ থেকে অকস্মাৎ মর্ত্যের মাটিতে নেমে এলো। তারা চমকে উঠলো, ভাবলো তাদের চলে যেতে হবে……

তবে……

সেদিন রাত্রিটা একরকম বিনিদ্র কাটল প্রেমসুন্দরীর।

শুয়ে সে ঘুমুতে পারল না, শুধু বিছানায় এপাশ-ওপাশ ফিরতে থাকল—দিল্লীর উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য নয়, আপন অন্তর্দাহে...

সে কী করবে...

সে ভাবতে থাকে···

সে ভাবতে থাকে তার জীবনে সুশান্তের কথা : অকস্মাৎ কেন এল এই তরুণ তার জীবনে, কেন সে গাইল গান : কেন সে শুনল তার সে গান, কেন সে তার কাছে শিখল বাঙলা, কেন সে তার কাছে পড়ল রবীন্দ্র-কাব্য। আজ সে এদের কোন অর্থ খুঁজে পায় না। মনে পড়ে তার, তার সংগে সুশান্তের পরিচয়ের ঘটনাটা। সে কথা মনে পড়ায় আজো সে মনে মনে লজ্জিত হল। তারপর কত সহজেই সে তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে, কত সহজেই না তাকে ক্ষমা করেছে। তারপর কখন কী ভাবে যে সে ঐ উন্নত প্রশান্ত উদ্দাম যুবককে আপন করে নিয়েছ, তার হিসেব আজ তার জানা নেই : সে জানে না কিসের মোহে সে ঐ বিদেশী মুগ্ধ তরুণের পিছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে, সে আজ শুধু জানতে পেরেছে। ওকে ছাড়া তার বেঁচে থাকা হবে শুধু বিড়ম্বনা, ওর অভাবে তার জীবন হয়ে উঠবে মরুময়···

তার যুবতী হৃদয় শুধু থেকে থেকে কেঁপে ওঠে···

সে ভাবে, সুশান্ত কী তার কথা ভাবে, ভাবে কী তার অভাবে তার জীবন হয়ে উঠবে শূন্য, ভয়ানক একা ; নয় সে শুধু তাকে গ্রহণ করেছে প্রিয় বান্ধবীরূপে। রবীন্দ্র কাব্য পাঠকালে সে ত্রস্ত হরিণীর মতো তার হৃদয়ের দ্বার-তটে ধাক্কা দিয়েছে কতবার ; কিন্তু কপাট খুলে ভিতরে ঢুকতে পারেনি একবারও। যদিও বাইরে মুগ্ধ এই যুবকের ভিতরের খবর যুক্তি দিয়ে সে বুঝে উঠতে পারে না , কিন্তু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে সে শুধু তার প্রিয় বান্ধবী নয়, সে তার আরও আরও কিছু······। সে দেখেছে পাঞ্জাবী ছেলেদের তুলনায় সুশান্ত কত ধীর, কত সংযমী।

কোনদিন কোনো সন্নিকর্ষী মুহূর্তেও তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। কোনোদিন কোনো সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় জনহীন যমুনার তীরে কখনও এসে এতটুকু আবেগেও বলে ওঠেনি—প্রেম তোমাকে······তোমাকে আমি ভালোবাসি। অথচ এই রকম মুহূর্তে এই কথাটুকু তার মুখ থেকে শোনবার জন্য সে কতদিন অন্তরে ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে ভাবে, সুশান্তই তার জীবনে প্রথম পুরুষ, যে তার স্বপ্নচারি যৌবনের ভাঙ্গিয়েছে ঘুম; তার বিবিক্ত হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছে প্রেমের বিবিক্ষা। সে কিছুতেই······কিছুতেই তার চলার পথে সুশান্ত-হীন হয়ে চলতে পারবে না,······না···কিছুতেই না····। সে আর চিন্তার আবর্তে ঘুরে ঘুরে নিজেকে কষ্ট দিতে চাইল না। সে সিদ্ধান্ত করল, কাল সন্ধ্যায় যমুনার সেই নির্জন অংশে সুশান্তকে তার নিজের কথা জানাবে, জানাবে দিল্লী ছেড়ে যাবার আগেই ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি অফিসে তাদের পৃথক দু'টী জীবনকে এক করে ফেলার কথা···।

পরদিন কী রকম একটা ভয়ানক অবসাদ নিয়ে ঘুম ভাঙ্গলো প্রেমসুরীর। বিছানায় উঠে বসে হাই তুলে জোরে গা মোড় দিয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, দেখল বেলা বেশ হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে উঠে কপাট খুলে বাইরে বেরোল। তারপর বাথরুমে যেতে যেতে সুশান্তের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সুশান্ত লিখছে। কিন্তু চলার গতি না কমিয়েই সে চলে গেল বাথরুমে। অবসাদ কাটিয়ে তুলার জন্য সে সকাল সকাল স্নান সেরে নিল।

ঃ সাত ঃ

সেদিন অপরাহ্ণে সকাল সকাল তারা বেড়াতে বেরোল। ঘর থেকে বেরিয়েই পরস্পর পরস্পরের পোষাক দেখে চমকে ঈষৎ হেসে উঠল; কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। সুশান্তের গায়ে প্রেমসুরীর

প্রথম উপহার দেওয়া সেই পাঞ্জাবী আর প্রেমসুন্দরীর পরণে সুশান্তের প্রথম উপহার দেওয়া সেই শাড়ী। তারা পরস্পরকে ভাবল, সে যেন তার 'বর', সে যেন তার 'বধূ'—তারা যেন চলেছে অভিসারে, সামনে তাদের বাসর রাত্রি।

যমুনার তীরে সেই নিমগাছটির তলায় বসতে বসতে পূর্বের কথার জের ধরে সুশান্ত বলল, 'প্রেমসুন্দরী তোমার ঋণ কোনো কালেই আমি ভুলতে পারবো না।

'আমার ঋণ!'

'কত টাকা যে দিয়েছ।'

সুশান্ত এই ম্যাজিষ্ট্রেট নন্দিনীর কাছে প্রায়ই টাকা নিত; কিন্তু ফেরত দিত না, ফেরত দিতে চাইলেও প্রেমসুন্দরী নিত না।

'টাকা!' প্রেমসুন্দরীর মনে হল সুশান্ত যেন তাকে তুলে আছাড় দিল। সুশান্ত তার টাকাকে ভুলতে পারবে না। হায়রে বিধাতা! কিন্তু চিত্ত-বিক্ষুব্ধতাকে চেপে রেখে বাইরে সহজ ভাব দেখিয়েই বলল, 'আর কোনো ঋণ'……

'তোমার 'ব্যচিলার্ সিগারেটকে ভুলতে পারবো না।' বলে কৌটা থেকে একটা সিগারেট বের করে সে ধরাল।

গেল এক বছর ধরে ভালোবাসার চিহ্ন স্বরূপ বেড়াবার কালে প্রতিদিন প্রেমসুন্দরী সুশান্তকে একটিন করে সিগারেট কিনে দেয়, আজো কিনে দিয়েছে একটিন।

'সিগারেট!' প্রেমসুন্দরীর কাঁদতে ইচ্ছে করল; কিন্তু আবার সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার আর কোনো ঋণ নেই তোমার কাছে।'

সুশান্ত বুঝতে পারে প্রেমসুন্দরীর প্রশ্নের মর্মার্থ; কিন্তু তা সে এড়িয়ে গেল, আছে—হোটেল রেস্তোরাঁয় কতই না খাইয়েছ, কতদিন কত উপলক্ষ্যে কত উপহারই না দিয়েছ।'

এবারে প্রেমসুরীর মাথা চাপড়িয়ে মরতে ইচ্ছা করল, – ধরণী দ্বিধা হও! এ বলে কী! কিন্তু এবারেও কোনো রকমে সামলে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু ?'

'আর তো কিছু মনে পড়ছে না।' বোকা লোকের লজ্জা পাওয়ার মতো ভান করে হাবা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল সুশান্ত।

'নিষ্ঠুর! ওঃ, তুমি কী নিষ্ঠুর'! এতোক্ষণে প্রেমসুরী ফেটে পড়ল। নিজেকে সে আর সামলিয়ে রাখতে পারল না। তার চোখের কোনে দেখা দিল অশ্রুকণা।

সামনের রক্তিম মলিন মুখ থেকে সুশান্ত মুখ ফিরিয়ে তাকাল দিগন্তের আর এক রক্তিম মলিন মুখের দিকে—যমুনার ওপারে দিনান্তের ক্লান্ত রবি অস্ত যাচ্ছে। তার লাল অবসন্ন মুখের দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল, কেন সে প্রেমসুরীকে ছলনা করল, কেন সে তাকে সত্য কথা বলল না। কেন সে এই বিদায় বেলায় তাকে কাঁদাল। সে নিষ্ঠুর, সত্যই সে নিষ্ঠুর…।

তার হাতে যে জ্বলন্ত সিগারেটটা পুড়ে ছাই হচ্ছিল। সেটা ফেলে দিয়ে সে প্রেমসুরীর দিকে মুখ ফেরাল। দেখল প্রেমসুরীর আঁচল দিয়ে চোখ মুচছে। উভয়ের মাঝখানে শায়িত প্রেমের ভ্যানিটি ব্যাগের ওপর থেকে তার রুমালটি তুলে নিয়ে সুশান্ত প্রেমসুরীর ডান হাতটি রুমাল সমেত আলতভাবে চেপে ধরল। তারপর অনুনয়ের সুরে বলল, 'প্রেমসুরী, আমাকে ক্ষমা করো। যে-কথা আমার একান্ত নিজের, সে কথা তোমাকে জানাতে চাইনি।'

প্রেমসুরী হাত টেনে না নিয়েই বলল, 'যে-কথা তোমার একান্ত নিজের বলে ভাবছ, তাতে যে আমারও অর্দ্ধেক রয়েছেঃ আমার প্রেমেই তো তোমার প্রেম পূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

'ম্লানি'।

'তবে কেন তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠ, কেন তুমি তা স্বীকার কর না।' কণ্ঠস্বরে প্রেমসুন্দরীর কাতর অনুযোগ।

'স্বীকার আমি করি; কিন্তু গ্রহণ করতে পারিনি'। চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় সুশান্ত।

'কেন'? প্রেমসুন্দরীর কণ্ঠে কোমল ব্যাকুলতা।

সুশান্ত তাকে বুঝিয়ে বলে, 'যে আদর্শবাদী পরিবারে আমার জন্ম, যে গ্রাম্য সমাজে, যে রক্ষণশীল পরিবেশে আমি মানুষ, সেখানে এ-প্রেমের নীড় বাঁধবার নেই কোনো অবসর; নেই সামান্যতম অধিকার'।

'আজকের এই আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের যুগে এ-কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। এটা কুসংস্কার'।

'জানি, একথা বলা আমার উচিত হয়নি, আর মানিও না এ কুসংস্কার; কিন্তু প্রেমসুন্দরী'—সুশান্ত হঠাৎ নীচের দিকে চেয়ে কী যেন ভেবে নিয়ে আবার মুখ তুলে বলল, 'আমাদের পথের পরিচয় সে থাকুক তার দিগন্ত বিস্তৃত পথে। কেন তাকে দেয়াল-ঘেরা আলো-বাতাসহীন গৃহ মধ্যে বন্দী করি। 'প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে' কেন তাকে মলিন করি। তুমি হয়ে থাকো আমার 'বন্যা'; আমি হয়ে থাকি তোমার 'মিতা'; আর আমাদের প্রেম আমাদের কাছে হয়ে থাকুক 'দীঘি'।

'বন্ধ করো তোমার ও-কাব্য। ও আমি শুনতে চাই না, সু—; আমি হতে চাই না তোমার 'বন্যা', হতে চাই না তোমার 'কেতকী'—যার প্রেম 'অমিতের কাছে হয়েছে ঘোড়ার জল। আর 'লাবণ্য'র প্রেমও তো ঘোড়ার জল হয়ে গেছে 'শোভনলালে'র কাছে—তার যৌবনের প্রথম প্রেমিক। আমি চাই না শূন্য আকাশের বায়বীয় প্রেম, আমি চাই মর্ত্যের প্রেম—মাটির ভালোবাসা। যে প্রেম আকাশে ডানা মেলে উড়ে, তা আমি চাই না; যে প্রেম মাটির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে, তাকে আমি চাই।'

মুখে তার প্রেমের ব্যাকুল বাণী, বুকে তার অনন্ত অশ্লেষ, দেহে তার পঞ্চশরের কামনা। সে সুশান্তের শ্লথ হস্ত মুষ্টি থেকে নিজের হাত বের করে নিল, তারপর তাব হাত দুটি নিজের কোলে টেনে নিয়ে জোরে চেপে ধরল।

সুশান্ত শিউরে উঠল। সে প্রেমসুন্দরীর মুখের দিকে মুখ তুলে চোখ মেলে তাকাল, দেখল, 'সাংখ্যের প্রকৃতি' যেন সৃষ্টির উন্মাদনায় তার আদিম উল্লাস কামনা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত।

সে শঙ্কিত, সে ভীত, সে নির্বাক।

সে কী করবে…, সে কী বলবে…

'কথা কও', প্রেমের কণ্ঠস্বরে কাতর অনুরাগ! পৃথিবীর প্রথম নরের কাছে যেন পৃথিবীব প্রথম নারীর আহ্বান।

সুশান্তের হাতে প্রেমসুন্দরীর কপোল বেয়ে পড়ল তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা।…

সুশান্ত বিচলিত হল। পাঞ্জাবী মেয়েও এতো দুর্বল? সে নিজেকে প্রশ্ন করলঃ এ যেন বাঙালী মেয়ে। হৃদয়ের দিক দিয়ে সব নারীই কী সমান—বাঙালী, পাঞ্জাবা জাপানী, মার্কিনী; অন্তঃপুরের নিরক্ষরা গৃহবধূ, রাজদণ্ডধারী বিদুষী শাসনকর্ত্রী, সাবিত্রী ক্লিওপেট্রা?…হয়তো তাই।…

কিন্তু · কিন্তু সে কি করবে।…

সে ভাবে,—আদর্শবাদী পিতার প্রথম সন্তান সে। পড়তে এসে প্রেম করে বউ ঘরে নিয়ে গেলে তার পিতা কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না। আধুনিক শিক্ষাহীন তার বৃদ্ধা মাতা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের এ আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। ত্যাজ্য-পুত্র হয়ে প্রেমসুন্দরীকে নিয়ে পৃথক থাকার ক্ষমতা তার থাকলেও বাপ-মাকে আঘাত দিয়ে সে নিজে সুখী হতে চায় না। না-না, এ তার পক্ষে অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব—

সে কোমল শান্ত হতাশার সুরে প্রেমসুন্দরীকে বলল, 'প্রেম যে সংসারের আমি সন্তান, সে-সংসারে তুমি কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। কল্পনায় তুমি যে প্রেমের সুখনীড় সৃষ্টি করেছ, বাস্তবের কঠিন-স্পর্শে মুহূর্তে তোমার সে সুখ-নীড় শুধু বেদনায় ভরে উঠবে, সেদিন সেই বেদনাময় শূন্যতার মধ্যে আজকের এই ভুলের অনুশোচনায় দগ্ধে মরবে। জানি, একথা তুমি বিশ্বাস করবে না; শুধু ভাববে, সুশান্ত পৌরুষহীন, হৃদয়হীন, সে নির্মম, সে নিষ্ঠুর, সে প্রতারক। জানি, আমার এই দুর্বলতার জন্য তুমি হৃদয়ে পাবে কঠিন আঘাত, তিলে তিলে দগ্ধ হবে মর্ম বেদনায়; তখন আমার প্রতি ঘৃণায় তোমার মন ভরে উঠবে। জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না, দেবযানীর মতো হয়তো অভিশাপ দেবে,—আমাকে ত্যাগ করে যে-বিদ্যা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছো, তা তোমার কোনো কাজে লাগবে না। যদি সে-যুগ হত, তাহলে আমি তোমাকে এই বিদায়-বেলায় বলে যেতাম,—তুমি আমাকে ভুলে যেও, তুমি সুখী হও, তারপর জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে সবুজ বাংলাকে যদি ধূসর সাহারা মনে হয়, যদি সারাজীবন আবার মন তোমার স্মৃতি-জড়িত দিল্লীর পথে-প্রান্তে বাতাসের সংগে উড়ে বেড়ায়, যদি আমার হৃদয় তোমার এ প্রেমময় তনুর চারিদিকে অশরীরী ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়, তবু···তবু প্রেম, তোমাকে···তোমাকে নিজের করে গৃহে নিয়ে যেতে পারবো না।'

কথাগুলো বলতে গিয়ে সুশান্তের বুক যেমন ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তেমনি তা সমভাবেই প্রেমসুন্দরীর বুকে শেলসম বিদ্ধ হচ্ছিল। নিজের সমতা হারিয়ে প্রেম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সামনের দিকে ঢলে পড়লো, কিন্তু মাটিতে পড়ার পূর্বেই সুশান্ত তাকে ধরে ফেলল।

তারপর ··

: আট :

তারপর পরদিন অপরাহ্নে তাদের দেখা গেল দিল্লীর রেলওয়ে ষ্টেশনে। ষ্টেশনে হাওড়াগামী পূর্বমুখী তুফান মেল মা-ধরিত্রীর যৌবনে জন্ম-দেওয়া কোনো বৃহৎ ক্রুদ্ধ সরীসৃপের মতো গর্জন করছে, আর প্ল্যাটফর্মে ট্রেণ-যাত্রী সসব্যস্ত নরনারীরা এই বৃহৎ সরীসৃপের ক্রুদ্ধ গর্জনে ভয়ে যেন কীটের মতো কিলবিল করছে। তারই একাংশে একটি ইণ্টার-ক্লাস কামরার সামনে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে; কিন্তু মুখে তাদের ভাষা নেই, শুধু বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের মতো দু'জনেরই মুখ থমথমে, দুজনেরই মুখ বিপদময়, করুণ। তাদের চোখের মলিন চাউনিতে তাদের অন্তরের মর্মান্তিক অন্তর্দাহী চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। কপালের ফোলা শিরায় যেন জীবন-শেষের পদচিহ্ন।

গার্ড-সাহেবের একটানা হুইস্‌লে তাদের যেন ধ্যানভঙ্গ হল। ঘাড় তুলে দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকাল।

সুশান্ত প্রেমসুরীকে বলল, 'তোমার ট্রেণ তো আসতে এখনো ঘণ্টা দু'য়েক বাকী; আমার ট্রেণ তো ছাড়ল, চলি···

সুশান্ত যাবে হাওড়ায়—তার দেশে; প্রেমসুরী যাবে বোম্বেতে—তার বাবার কাছে।

ট্রেণ চলতে সুরু করল। সুশান্ত উঠে পড়ল; কিন্তু না বসে হাতল ধরে দরজায় দাঁড়াল। সে দেখতে পেল প্রেমসুরা উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে রুমালে চোখ মুছছে।

প্রেমসুরী কাঁদছে···

প্রেমসুরী কাঁদছে আর ভাবছে···

···কেন প্রেমসুরী আপনার পথ পায় না, কেন··, তা সে জানে না। কিন্তু হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে, নিজের একান্ত প্রিয়জনকে ছেড়ে মানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা, একান্তই বিড়ম্বনা,—বিশেষ করে নারীর

পক্ষে। নারীর কাছে তা মরণের সামিল। তার পক্ষে সুশান্তকে ছেড়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব···। না-না-না, সে কিছুতেই পারবে না · কিছুতেই পারবে না। সুশান্তের সঙ্গে সে চলে যাবে।

ছুটে সে ট্রেণটা ধরতে চাইল; কিন্তু পারলো না। ট্রেণটা তখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে মেন লাইনে সরীসৃপের মতো বাঁক নিয়ে নিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম প্রান্তে প্রেম প্রাণহীন পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে তাকিয়ে রইল

আর সুশান্ত

প্রেমসুন্দরীর পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে চোখ মোছায় সে বুঝতে পারল প্রেমের মনের অবস্থা—বুঝতে পারল প্রেমসুন্দরীর আবার ভেঙ্গে পড়েছে।

কিন্তু সেদিক থেকে সে মুখ তুলে তাকাল অস্ত-সূর্যের দিকে। সূর্য্যের ক্লান্ত মলিন লাল মুখের দিকে চেয়ে সে তাকে প্রশ্ন নিক্ষেপ করল,—মানুষের কেনো এতো বন্ধন, কেনো এত অবিচার!

আর ভাবে—তারপর তার প্রেমশূন্য জীবন কী ভয়ানক শূন্য, কি ভয়ানক একা হয়ে উঠবে।

ট্রেণের চলার গতি যত দ্রুত বাড়তে থাকে, তার কঠিন মনে এই দুর্বলতা ততো দ্রুত বড়ো হয়ে উঠতে থাকে।

নিজেকে তার মনে হল—পৃথিবীর প্রথম মানবের মতো তার জীবন কি শূন্য, কি ভীষণ শূন্য; নির্জন দ্বীপে বন্দী মানুষের মতো সে একা, ভয়ানক একা।

সে ভাবতে থাকে—এই ভীষণ শূন্যতা, এই ভয়ানক একত্বের মধ্যে তাকে আরো বহুদিন এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে হবে, যে বেঁচে-থাকা হবে তার কাছে দুর্বিসহ জ্বালাময়ী আগুন—যে আগুনে সে সারা-জীবন তিলে তিলে দগ্ধে মরবে। কেন কেন সে নিজেকে এমন করে তিলে তিলে ক্ষয় করবে; কেন সে প্রেমসুন্দরীর জীবনকে ব্যর্থ করে দেবে,

শুধু একটা দুর্বল সেন্টিমেণ্টের জন্য দু'টি সম্ভাবনাময় জীবনকে কেন সে নষ্ট করে দেবে। না, তা সে হতে দেবে না কিছুতেই না। সে হঠাৎ ভীষণ সচেতন হয়ে উঠল। তার মন ভীষণ বলিষ্ঠ হয়ে উঠল—সে প্রেমসুন্দরীকে সংগে করে দেশে নিয়ে যাবে—পরের ট্রেণে একসংগে। তাড়াতাড়ি সে ট্রেণ থেকে নামতে চাইল ; কিন্তু পারল না।

তুফান-মেল তখন তুফান বেগে চলেছে।

বৈশাখ, ১৩৬০

সমাপ্ত